KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৮/২ বি, ঈশ্বর মিল লেন, কল-৮
Collection : KLMLGK	Publisher : সুবীর দাস
Title : অস্থি মজ্জা (ASTHI MAJJA)	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 1 3/2	Year of Publication : ১৩৯১ (আষাঢ় সংখ্যা) Aug 1984
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সুবীর দাস	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

অগ্নি সত্তা

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০,০০৯

সম্পাদনা
সুবীর দাস

অস্থিমজ্জা

১ম সংখ্যা, শারদ '৮৮

সূচীপত্র

গল্প

সুমন সেনগুপ্ত ১
অলক কুমার মুখোপাধ্যায় ৪
সমর নাথ চট্টোপাধ্যায় ১০
অশোক পোদ্দার ১৯
সুবীর দাস ২১

অনুবাদ গল্প

চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩

কবিতা

সজল বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৫
পবিত্র মুখোপাধ্যায় ৩৬
অরুণ গঙ্গোপাধ্যায় ৩৭
সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায় ৩৭
সুশীল পাঁজা ৩৮
নৃসিংহ মুরারী দে ৩৯

সাক্ষাৎকার

উপেক্ষিৎ শর্মা ৪০

প্রচ্ছদ : রঞ্জিত দাস

দুই টাকা মাত্র।

মুখ্যত গদ্যের পত্রিকা

তরুণ লেখকদের কাছে গদ্যের পত্রিকার অভাব হেতু 'অস্থিমজ্জা'র জন্ম। এবং তা লিট্‌ল ম্যাগাজিনের চরিত্র নির্ভর হয়েই। যদিও এই সংখ্যা প্রচণ্ড তাড়াহুড়োর মধ্যে শেষ করতে হলো, তবে ভবিষ্যৎ সংখ্যা-গুলো যে আরো বেশী বলিষ্ঠ হবে এ একরকম সুনিশ্চিত। গদ্যের পত্রিকা হয়েও কবিতার প্রতি পূর্ণ উদাসীনতা দেখানো সম্ভব হলো না কারণ 'অস্থিমজ্জা' জানে লেখকের কাছে সেও এক বহু যত্নে লালিত সময়। সুতরাং লেখক এবং পাঠককুল নজর রাখুন পরবর্তী সংখ্যাগুলোর দিকে এই আশায়—

সম্পাদকীয়

সম্পাদক : সুবীর দাস

With Best Compliments From :

BSSP ENGINEERING

Engineers & Contractors

21B H. K. Sett Lane
Calcutta-700050

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

ময়না তদন্ত

—সুমন সেনগুপ্ত

অবশেষে গোকুলচাঁদ সুইসাইড করল। তার মৃত্যু শুধু নিজের চেনা জগৎকে ধাক্কা দেয়নি। মফঃস্বল শহরের দারোগার কাছে এ যেন এক অনিয়ম। আসলে কথাটা ঠিক, গোকুলের মতো চোরেদের মৃত্যু কি সুইসাইডে হওয়া উচিত? তারা তো শুধু মার খাবে ও বৃথা মার আটকাবার চেষ্টা করবে। ওদের ইজ্জৎ তো দারোগাদের হাতের মুঠোয়। ওদের জীবনের বেশীর ভাগ অংশ কেটে নেয় সমাজ। মৃত্যুর পরেও তাকে রেহাই দেয়নি। এ ব্যাপারে পুলিশ তার সাত বৎসরের পুরুকে জেরা করতে ছাড়েনি। এ সকল কার্য বিচারের ভাষায় নিয়ম। যে জিনিসটা দারোগার মনটা দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে দিয়েছে—তা হলো, মাসখানেক গকুলচাঁদ ছিল বড়ই উদাসীন। এহেন নিরাসক্তি কী সহ্য করা করা সম্ভব? না না, উদাসীন কেন থাকবে তারা? তারা হয় ভয় করুক, না হয় ঘৃণা করুক—কিছু একটা করুক। তাই এ অঞ্চলের দারোগা বলেছেন, 'গকুলের কেসটি সুইসাইড নয়'। এ ব্যাপারে সাংঘাতিক সব যুক্তি দিয়েছেন—হতাশা থেকে আত্মহত্যার বীজ বপন হয় না, হলে ভারতের আশি শতাংশ মানুষ আত্মহত্যা করত। এক্ষেত্রে দারোগাকে না হয় রসিক বলা গেল। কিন্তু যার প্রসঙ্গে এত কথা, সেই গকুলচাঁদের গভীর স্নায়ুতে নিশ্চয়ই কতকগুলি দাগ ছিল। নইলে কেন, মৃত্যুর কয়েক দিন আগে দেহ বিক্রি করা মেয়েটিকে বলেছিল, 'চল আমরা পালিয়ে যাই, পৃথিবীতে এখনো অনেক জমি আছে ব্যবহার করার মতো'। আসলে বোধহয় গকুলচাঁদ নিখুঁতভাবে আত্মরক্ষার উপায় আবিষ্কার করে ফেলেছিল। তবে ও কেন আত্মহত্যা করল? আত্মহত্যা কি প্রতিবাদ? যাক, সে সব কথা, কারণ এ ব্যাপারে সংশয় থাকবেই। আসল কথা, গকুলচাঁদ মরেছে। পৃথিবীতে সে ছিল চোর। তারই পরিপ্রেক্ষিতে দারোগা শিবকালী মণ্ডল চরিত্রগুলি পর পর সাজিয়ে নিচ্ছেন।

একনম্বর চরিত্র: গকুলচাঁদ, সনাক্ত করার পক্ষে সবচেয়ে সহায়ক ওর ডান চোখের নিচে কাঁটা দাগ। দিবালোকে কোনদিন জুতো পরেনি।

তবে রাতের অভিযানে তার সঙ্গী ছিল বহুদিনের পুরনো এক জোড়া কেডস। ডান হাতের আঙুলের গাঁটগুলো ছিল ফুলো ফুলো। কথা বলার সময় কথা আটকে যেত। চোখে মুখে সব সময় একটা বোকা বোকা ভাব। তবে বলা বাহুল্য মৃত্যুর কয়েকদিন আগে লজ্জা লজ্জা ভাব ছিল। কেন, তা জানা যায়নি। অলস মন্থর দিনে বটগাছের তলায় কিংবা বিশ্বাসদের পরিত্যক্ত বাড়ীতে জুয়া খেলত। হেরে গেলে খিস্তি করত। তবে কোনদিন ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে মারামারি করেনি। মাঝে মাঝে মদ খেত। বেশ্যা বাড়ী যেত। তবে কোনদিন নিজের বৌকে পেটায়নি। কোলকাতা দেখিয়ে আনবার নাম করে বৌয়ের ডিম্বনালী কাটিয়ে এনেছিল। ডিম্বনালী বেচার টাকায় মাংস খেয়েছিল। নিজের হাতে অন্যের জান খতম করার সাহস কোনদিন দেখায় নি। বস্তুত গকুলচাঁদ ছিল একজন পেশাদার চোর, যথেষ্ট পয়সা পেত না তবে উৎসাহ ছিল।

দু'নম্বর চরিত্র: পরানচাঁদ, গকুলের পিতা। ছেলের মৃত্যুর আগের দিন রাতে চায়ে চিনি কম হওয়ার অজুহাতে কাপ ছুড়ে মেরেছিল গকুলের বৌকে। পরানচাঁদ বছর সাতেক আগেও ছিল বেশ্যার দালাল। শোনা যায়, বিভিন্ন রাজ্য থেকে মেয়ে কেনা বেচার ব্যাপারে সে নাকি জড়িত ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, পরান চাঁদের অনেক অধ্যাতির ইতিহাস এ অঞ্চলে খুবই প্রচলিত। প্রথম যখন এ অঞ্চলে আসে তখন ওর বয়স কুড়ি একুশ। এ অঞ্চলটা তখন ছিল যাকে বলে অজ পাড়াগাঁ। সন্ধ্যা হলেই অন্ধকার ঘনিয়ে আসত। সে সময়টা পরানচাঁদ মরা পুড়িয়ে জীবন ধারণ করত, তবে সেটা ছিল অনিয়মিত। মাঝে মাঝে লাশ বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য লোক পাওয়া যেতনা। ফলে পরানচাঁদকে একা লাশ টেনে নিয়ে যেতে হতো। মাঝে বছর পাঁচেক সে এ অঞ্চলে ছিল না। পাঁচ বছর পরে ছেঁড়া তোশক, হাঁড়ি বালতি কেরোসিন ডিবে এবং বৌ নিয়ে এলো। কিছুদিন পর পর পরানচাঁদ বৌ পাল্টাত। সে যাই হোক, আসলে সে এ অঞ্চলে একটা বেশ্যা পল্লী গড়ে তুলল। এবং গকুলের পিতা একজন পেশাদার পাপী।

তিন নম্বর চরিত্র: গকুলের স্ত্রী কিশোরীবালা। বেশ্যাপল্লীতে জন্ম হলেও ভদ্র বাড়ীতে মানুষ। ছয় বছর বয়স থেকে সে দত্তদের বাড়ীতে

কাজ করত। দুবেলা খাওয়া আর রাতে চটের থলির উপর শিঁড়ির নিচে শোওয়া। আরোও বছর তিনেকপরে মাঝে মাঝে দু-তিনটি সিনেমা। বছর তেরোতে নিজের শরীরকে আবিষ্কার করে চমকে ওঠা। তারপর হঠাৎ একদিন মা হয়ে যাওয়া।

শিবকালীর তোবড়ানো মুখটায় ক্ষোভ ও বিরক্তি। তার কপালে ও মুখে অসংখ্য রেখার আবির্ভাব ঘটেছে। কেননা তদন্তের মালিকানা সম্পূর্ণভাবে তার, অর্থাৎ

তদন্তের রিপোর্ট: সত্যি কথা বলতে কি যারা চুরি করে তারা আসলে মানসিক পরিশ্রম করে। আজকাল কেউ বা কারা তাদের মধ্যে একটা ভুল ধারণার বীজ বপন করার চেষ্টা করছে যে পৃথিবীর শাসনভার আস্তে আস্তে তাদের হাতে চলে যাবে। আসলে এটা একটা সন্ত্রান্ত চালাকি, গকুলচাঁদের মতো লোকেরা এসকল ধারণায় অস্বস্তি বোধ করে। নিজেকে পৃথিবীতে আরো বেশী অসহায় ভাবতে ভাবতে আত্মহত্যা করে বসে, সাধারণের মধ্যে থেকে নিজেকে আলাদাভাবে জাহির করার এর চেয়ে আর কোন সহজ উপায় নেই বলেই।

SUPER INDIA

B-2, School Road, P.O. Sodepure
Dist. 24-Paraganas

Dealers in :

All sorts of Industrial Tools, Pipe & Pipe Fittings, Valves & Cocks, M. S. Road, Angle, Bar etc. G. 1 & M.S. Sheet, Nut, Bolt & Hardware Items, Beltings, Paints, Asbestos Goods Cotton waste and General Order Supplier.

Manufacturer of :

PLASTIC PRODUCTS AS PER DESIGN.

বুনো ঘোড়া

অলোক কুমার মুখোপাধ্যায়

অরিন্দমের ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। ঘামে পিঠ ভিজে গেছে। ওপর দিকে তাকাতে নজর পড়ল পাখার ব্লেডগুলো আস্তে আস্তে থেমে যাচ্ছে। তার মানে লোডশেডিং। বালিশের পাশ থেকে রিষ্টওয়াচটা তুলে নিয়ে ঘুম চোখে দেখল সাড়ে চারটে। চোখের পাতার আঠাল ঘুম, অথচ শোওয়ার উপায় নেই। পাশেই চৈতীর শরীরটা পড়ে আছে। এখনো ঘুম ভাঙেনি। ঘুমিয়ে পড়লে ওর গরম শীত বোধ থাকে না। ঘুমন্ত চৈতীকে দেখলে কি রকম ছেলেমানুষ ছেলেমানুষ মনে হয়। আরো ভালবাসতে ইচ্ছে করে। দিনভর কাজ-কর্ম হাসি রাগ অভিমান এই শরীরটার মধ্যে কোথায় যে লুকিয়ে থাকে ঘুমন্ত দেখলে বোঝার উপায় নাই।

আর ক'ঘণ্টা বাদে অরিন্দমকে যেতে হবে হাওড়া ষ্টেশন। কবিতা আর ওর বাবা মা আসছে। কবিতা মানে সেই লক্ষ্ণৌর বাসিন্দা সেক্রেটারীয়েটশিপ্, পাশ চৈতীর মাসতুতো বোন। কবিতা মানে অরিন্দমের ভেতর এক ধরনের অস্থিরতা। একটা বুনো ঘোড়ার বুকের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাওয়া। কবিতা আহামরি সুন্দরী নয় তবু সাড়ী জড়ানো সাপের মতন শরীর, স্বচ্ছ চাহনি, কথার মধ্যে উপহাসের ছোঁয়া অরিন্দমের কাছে কেমন দুর্বোধ্য আকর্ষণের মতন মনে হয়। এ দুবছরে অরিন্দমের সত্তা ও প্রকৃতি কবিতার সান্নিধ্যে এসে কেমন সাচ্ছন্দ খুইয়ে বসেছে।

ক'মাস আগে রানীক্ষেত থেকে ফেরার সময় দিন চারেকের জন্যে অরিন্দম আর চৈতী লক্ষ্ণৌতে ওদের বাড়ী উঠেছিল। প্রতিটা দিন হৈ চৈ কোথাও না কোথাও যাওয়ার মধ্যে দিয়ে কেটেছিল। তিনজনে কত গল্প করেছে, তির্যক হাসি বাঁকা ঠাট্টার ঢেউ ঝাপিয়ে কবিতা নিজেকে সাবলীল প্রমাণ করেছে। পড়ন্ত বিকেলে ছাদের ওপর চৈতী ও অরিন্দমের কত রকম ছবি তুলে দিয়েছে সহজ স্বাচ্ছন্দে। অথচ অরিন্দম ততটা সহজ হতে পারেনি। বুনো ঘোড়াটার হেঁটে যাওয়ার টের পেয়েছে। কবিতা যখন লক্ষ্ণৌর বিভিন্ন জায়গা ঘুরিয়ে দেখিয়েছে, তাদের ইতিহাস বলেছে অনায়াস

ভঙ্গিমায় অরিন্দমের তখন কেন কে জানে মনে হয়েছে কবিতা একটা পাহাড়ের পাকদণ্ডী বেয়ে ওকে ছাড়িয়ে উঠে যাচ্ছে, হাতে একটা লাল গোলাপ আর অরিন্দম কিছুতেই নাগাল পাচ্ছে না।

ষ্টেশনে পৌঁছে অরিন্দম দেখল গাড়ী এসে গেছে। ওরা প্ল্যাটফরমের কোথাও নিশ্চয়ই ওর জন্যে অপেক্ষা করছে মনে করে এগোতে এগোতে দূর থেকে দেখতে পেল চৈতীর মাসিমা মেসোমশাই দাঁড়িয়ে আছেন আর ওঁদের পাশে পাকা করমচা রঙের সাড়ী জড়ানো ছিপছিপে শরীর নিয়ে কবিতা দাঁড়িয়ে। কানে হাতে টুকিটাকি গয়না, মুখে ট্রেনের ক্লান্তির ছাপ, শুধু চোখের মধ্যে যে কালো দিঘীটা ছিল অরিন্দমের সঙ্গে চোখাচোখি হওয়াতে সেখানে হাসি আর আনন্দের ছটোপুটি। দুহাত জোড় করে বলল, 'কেমন আছেন? চিনতে পারেন?' এই নমস্কার, পরিমিত ঠাট্টা এসবই কবিতার বৈশিষ্ট অরিন্দমকে যা টেনে নিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ী পাকদণ্ডী পথে। অরিন্দমের মনে আছে বিয়ের পর অষ্টমঙ্গলার দিন চৈতীদের বাড়ী পৌঁছতেই ও বলে উঠেছিল,

—কি মশাই আপনি যে ভাল মেকাপম্যান তা তো জানতুম না।

অরিন্দম অবুঝ মুখে ওর স্বচ্ছ চোখের দিকে তাকিয়েছিল, যে চোখের গভীরতায় কিছু ধরা ছোঁওয়া যায় না শুধুই ঝিলিক ছাড়া, সেই চোখ চৈতীর দিকে ঠেরে বলেছিল,

—ব্যাপারটা বেশ ধরে নিয়েছেন দেখছি, না কি আগের থেকেই অভিজ্ঞতা ছিল?

অথচ বিব্রত অরিন্দম বলতে পারেনি চৈতীকে সাজ'নোর ব্যাপারটা মেয়েদের এক্তিয়ারে, অরিন্দমের কোন হাত নেই। সেই সময় থেকেই অরিন্দমের বুকের মধ্যে বোধহয় বুনো ঘোড়াটার হাঁটা চলা শুরু।

সে যাক আজকে এই মুহূর্তে অরিন্দমের মেধা ও বোধশক্তি কেমন নির্লিপ্ত মনে হল। সেই অবোধ্য আকর্ষণ আর নিয়মবিরুদ্ধ অস্থিরতা আস্তে আস্তে ছেয়ে আসছে কুণ্ডলীকৃত মেঘের মতন মন জুড়ে দেহ জুড়ে পরিবেশ ও পরিস্থিতি জুড়ে। পালানো স্বাচ্ছন্দটুকু হাতড়িয়ে এনে হাত তুলে প্রতিনমস্কার করে রহস্যের চোখে ও বলল,

—কি রকম মনে হচ্ছে?

—পারফেক্ট মধ্যবিত্তের মতন।

—ধন্যবাদ বলে অরিন্দম মাসিমা মেসোমশাইকে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছেন আপনারা'?

এ বয়সে যে রকম থাকা উচিত সে রকম আছি। তোমাদের ভাল-থাকাটাই বেশী দরকারী। চৈতী কেমন আছে? মেসোমশাই বললেন।

মাসিমা বালুরঘাটে থাকা অরিন্দমের বাবা মার খবর নিলেন।

—চলুন এগোনো যাক, বলে অরিন্দম কুলি ডেকে মালপত্র চাপিয়ে সকলকে নিয়ে ষ্টেশনের বাইরে এসে ট্যাক্সীর লাইনে এসে দাঁড়াল। এপ্রিলের ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর ইতিমধ্যে শহর, পথঘাট মানুষের ওপর উত্তপ্ত জাজিম বিছিয়ে দিয়েছে। খানিকটা রোদ কবিতার সাড়ীর ওপর পড়ে দাঁড়ানো কবিতাকে খোলা আকাশের নীচে কেমন ঝকঝকে করে তুলেছে। কি রকম ধারালো মনে হচ্ছে।

ট্যাক্সীতে যেতে যেতে ছোট্ট রুমালে কপাল গাল মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করল,

—কোলকাতায় লোডশেডিংয়ের দাপট কেমন?

—প্রচণ্ড, অরিন্দম বলল।

—এর মধ্যেও আপনারা বেশ বহাল তবিয়তে আছেন।

মেশোমসাই বললেন,—আচ্ছা মানুষের সহিষ্ণুতা বোধহয় বেড়ে গেছে, তাই না?

—আমার ধারণা সহিষ্ণুতাই বলুন আর যাই বলুন মানুষ এ সব গা সওয়া করে নিয়েছে, অরিন্দম বলল।

—সত্যি কোলকাতাটা দিনকে দিন কেমন জমাট-ভরাট উপচে পড়ার মতন হয়ে উঠছে। মেসোমশাই ফের বললেন।

মাসিমা বিশেষ কথাবার্তা বলছেন না, গাড়ীর ধকলে খানিকটা ক্লান্ত। আর শ্রান্ত কবিতাও এখন আনমনা। সানগ্লাসের মধ্যে দিয়ে কোলকাতাকে দেখতে দেখতে হয়ত ছোটখাটো ভাবনার মধ্যে উড়ে চলেছে। দুএকটা ঘামে ভেজা চুল কপালে লেগে আছে। ওর দিকে তাকাতে তাকাতে অরিন্দমের চৈতীর কথা মনে পড়ল। ঘামে ভেজা মুখ নিয়ে কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে হয়ত চৈতী বারান্দায় এসে দাঁড়াচ্ছে। কবিতার সঙ্গে ওর সম্পর্কটা বোনের চেয়ে বন্ধু হিসেবেই বেশী। অনেক কথা অনেক আলাপন জমে আছে দুজনের মধ্যে। চৈতীকে নিয়ে অরিন্দম সুখী। সবদিক দিয়েই

ও অরিন্দমকে ভরিয়ে রেখেছে। ভরা বসন্তের মতন শরীর কিংবা টিকালো নাকে নাকছাবির ঝিলিক অরিন্দমকে মাঝে মাঝে পাগল করে দেয়। তবু দুজনকে পাশাপাশি দেখলে কবিতার পাল্লা বেশী ভারী মনে হয়। কবিতাকে কাছে পাওয়া ইত্যাদি ভাবনার মধ্যে কোন পাপবোধ জন্ম দিতে চায় না অথচ সেই পাপবোধটাই ভেতরে উকিঝুঁকি মারে।

ট্যাক্সী ইতিমধ্যে টালিগঞ্জ ট্রামডিপো ছাড়িয়ে কুঁদঘাটে এসে পড়ল। অরিন্দম নিশ্চয় কবিতাকে জিজ্ঞেস করল,

—কোলকাতার এদিকে আগে এসেছ?

—ধনুকের মতন ভুরু ভাঙ্গ্যুর করে কবিতা বলল।

—কি করে দেখব? জন্ম চন্দননগর, তারপরই লক্ষ্ণৌ। ভাগ্যিস আপনি ভগ্নীপতি হলেন তাই এদিকটা চেনা হল।

—কিন্তু তোমার বোনের বিয়ে এদিকে না হলেও তো ভবিষ্যতে এ জায়গায় তোমার ঠিকানা গড়ে উঠতে পারত। অরিন্দমের চট্‌জলদি জবাব।

—সে সম্ভাবনা নেই। কবিতার স্থির নিশ্চিত স্বর। বাড়ীতে পৌঁছিয়েই খানিকটা হৈ চৈ উচ্ছ্বাস। মাসিমার চোখে চৈতী রোগা হয়ে গেছে। মেসোমশাইয়ের চোখে চৈতী একই আছে। কবিতা বলল, 'চৈতী আরো ফরসা হয়েছে। অরিন্দম হয়ত মনে মনে কবিতাকে বলল—তুমি তো তেমন ফরসা না হয়েও আমার আমিত্বটাকে ভোঁতা করে দিয়েছো। দৃষ্টির মধ্যে, নাগালের মধ্যে তোমার উপস্থিতি তো বেশ ভালই লাগে। ভেতরে সুর বাহারে বাগেশ্রী বাজে অথচ এই ভালোলাগা থেকে কোন কিছু জন্ম নিক তা আমি চাইনা।'

এখানে কবিতারা দিন সাতেক থাকবে। তারপর যাবে নিজেদের বাড়ী।

এই সাতদিনের প্রথম ছ'দিন কবিতা বাড়ী থেকে কোথাও বের হয়নি। চৈতীর সঙ্গে অরিন্দমের সঙ্গে হাসি গল্প নিজের হাতে রান্না করে খাওয়ানো কিংবা রেকর্ডপ্লেয়ারে সরোদের লংপ্লেয়িং শুনে কাটিয়েছে। অরিন্দম জানে ও সরোদ শুনতে ভালবাসে। আমজাদ আলি ওর ফেবারিট্। অরিন্দমকে এ কদিন ছুটি নিতে হয়েছে। কবিতার সান্নিধ্যে নিজেকে মাঝে মাঝে হারিয়ে ফেলেছে। সেই অস্থরতার শিকার হয়েছে।

যাবার আগের দিন ওরা তিনজনে ম্যাটিনী শোয়ে সিনেমা দেখে আউট্রামঘাটে এসে বসল। চৈত্রের শেষ বিকেলের রোদ গঙ্গার ছোট ছোট

গড়ানো ঢেউয়ের ওপর পিছলে যাচ্ছিল। গরমের তাত যথেষ্ট তবু গঙ্গার দামাল বাতাস শরীরে মাখামাখি হয়ে এক ধরনের আরাম দেয়। বসে থাকতে ইচ্ছে। ওপারে চিত্রপটের মতন গাছপালা চিমনির ধোঁয়া কিংবা ডিমের কুসুমের মতন সূর্য্যের অস্তিত্ব এ সকল সবাইকে কেমন আচ্ছন্ন করে দিল। কিংবা এও হতে পারে কবিতারা কাল চলে যাবে বলে চৈতী কিছুটা বিষণ্ণ। কবিতাও হয়ত চলে যাওয়ার ভাবনায় অন্যমনস্ক কিংবা আরো কিছু ভাবনা হয়ত ভেতরে সাঁতরে বেড়াচ্ছে। অরিন্দম সিগারেট ধরিয়ে ভাবল সকলেই কি রকম চুপচাপ হয়ে গেছি। কবিতারা কাল চলে যাবে। চলে যাওয়াটা স্বাভাবিক। সময়ের গণ্ডী বেঁধেই ও এসেছিল আর এভাবেই কাছাকাছি আসা যাওয়া। ভারীমন নিয়ে ও নিজের মনে বলে উঠল,—কটা দিন বেশ কাটল। পাওয়ার ঘরে অনেক কিছু পাওয়া গেল।

মনে মনে বলল এই দুটো বছরে কয়েকবারতো এই অনবদ্য আকর্ষণের মুখোমুখি হতে হল। ইচ্ছা অনিচ্ছার মাঝখানে নো ম্যান'স ল্যাণ্ডে যে একগুচ্ছ লাইলাক ফুল ফুটে রয়েছে ও এই পরিচ্ছন্ন বিকেলে বুঝতে পারল। অজান্তে ভয় ভাবনাগুলো কেমন যেন নড়া চড়া করে উঠল। সাড়ীর আঁচলটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে কবিতা জিজ্ঞেস করে উঠল,

—আচ্ছা অরিদা, মানুষের জীবনে উল্লেখযোগ্য ঘটনা কি?

অরিন্দমের ভেতরকার লাইলাক গুচ্ছটা হঠাৎ কথা কয়ে উঠল,—প্রেমে পড়া।

চকিতে মুখের মধ্যে ছুটে আসা রক্তছটা আর গোধূলির রক্ত আভা মিশে কবিতা কেমন রক্তিম হয়ে উঠল।

—কিভাবে যে কি হয়ে যায় বুঝতে পারি না। শুধু এটুকু বুঝতে পারি নিজেকে এ সময় ভীষণ সুখী মনে হয়। মনে হয় একটা সাজানো বাগানের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি।'

কবিতার স্বর কেমন স্বগতোক্তি কৈফিয়ৎ দেওয়ার মতন শোনাল। আরো কিছু বলতে চায় অথচ স্বাচ্ছন্দ খুঁজে পায় না।

চৈতীর চোখে বিস্ময় তার সঙ্গে প্রশ্ন,—সে কিরে? কবে? কার সঙ্গে?

অরিন্দম যথেষ্ট ভয়াশ্রিত, বিমূঢ়। ওর অস্থিরতা, নিজেকে হারিয়ে যাওয়া কি কবিতাকেও ছুঁয়ে গেছে? কবিতার মধ্যে ও লাইলাক্ ফুটে রয়েছে, বুনো ঘোড়া হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে? একটা আশংকা পেটের মধ্যে

পাক খেয়ে ওপর দিকে উঠতে লাগল। স্পষ্ট চোখে কবিতার দিকে তাকাতে পারল না।

চৈতীর প্রশ্নের জবাবে কবিতা কাঁপা স্বরে বলল,—সুস্মিত চৌধুরী, লক্ষ্ণৌতে থাকে।

সুস্মিত চৌধুরী নামটা শুনে অরিন্দম নিজেকে একটু সাহসী বোধ করল, কবিতার দিকে তাকাতে পারল। নিশ্চিন্ত চাউনিতে হাত বাড়িয়ে বলে উঠল,—কনগ্রাচুলেশনস্'।

পেটের মধ্যে আশংকাটা আর পাক খেয়ে উঠছে বলে মনে হল না। বুনো ঘোড়াটা এখন সবুজ ঘাসের মাঠে হেঁটে বেড়াচ্ছে বলে বোধ হল। অরিন্দমের অভিনন্দনের জবাবে কবিতা মাথা নিচু করে একটু হাসল।

চৈতী জিজ্ঞেস করল মাসিমা মেসোমশাই জানে? কবিতা ঘাড় নেড়ে জানাল, 'না জানেনা। চৈতীর ফের মেয়েলী কৌতূহলে প্রশ্ন, '—কেমন দেখতে রে?

কবিতা বলল,—একজন পুরুষ মানুষের মতন। হাল্কা অরিন্দম আরো হাল্কা হওয়ার জন্যে ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল,

—চল চল একটু কফি খাওয়া যাক। ওরা তিনজনে আস্তে আস্তে পা বাড়াল কিনারার গায়ে রেস্তোঁরার দিকে। ঘরে ফেরা সূর্য্যের হালকা আলোর আস্তর তখন ওদের শরীরে, জাহাজের মাস্তুলে, কয়েকটা জেলে ডিঙ্গির গলুইয়ের ছাদে।

পত্রিকা সম্পর্কে আপনার সুচিন্তিত মতামতের
অপেক্ষায় দিন কাটাবে 'অস্থিমজ্জা'র লেটার বক্স

নপুংষক

সমরনাথ চট্টোপাধ্যায়

ঘন অন্ধকারের মধ্যে কি যেন খুঁজলো সমবুধ। কি যেন হাঁতড়ে হাঁতড়ে খুঁজলো। নিজেরই হাত দিয়ে নিজের মাথা থেকে পা অব্দি আগা-পাশ-তলা খুঁজে খুঁজে দেখলো। কি যেন পাবে। কি যেন পাবার কথা আছে। কিন্তু কিছুই পেল না।

কি খুঁজলো সমবুধ? কি খুঁজলো? কিছু হয়ত খুঁজছে। কিম্বা কিছুই খুঁজলো না। পাশে নির্মদ শুয়ে আছে মধুষ্কা। অন্ধকারের মধ্যে আনটপ্‌কা ওর গায়ে হাত পড়ল। কেঁপে উঠল মধুষ্কা। না, কেঁপে উঠল না নড়ে উঠল। না, ঠিক তাও না। নড়েও উঠল না; ওর কণ্ঠনালী বেয়ে একটা স্পষ্ট স্বরকম্পন হল মাত্র।

—আন্তদাকে আমার দারুন ভাল লাগে। প্রসঙ্গটা পুরনো, তবু শব্দগুলো নীল ঘূর্নি হয়ে সমবুধের কানে প্রচণ্ড আঘাত করলো। মুহূর্তে সমবুধের চুলগুলো বেগুনকাঁটার মত খাড়া হয়ে গেল। রাগে আর উত্তেজনায় ওর সমস্ত পরিকল্পিত শব্দবাকগুলো আল্‌জিভের তলায় একটা প্রকাণ্ড তোতলা হয়ে লট্‌কে রইল। কোন কথা বল্লো না। কোন কথা বলতে পারল না। গুম্‌ হয়ে বসে রইল সমবুধ। আর মধুষ্কা আবার সেই প্রসঙ্গের খোঁচা দিল,

—তোমার বুঝি আন্তদাকে একদম সহ্য হয় না! আমার কিন্তু...

—আমার, আমার কিন্তু বগলে একঝাঁক কোড়া। সাবধানে কথা বলো, বলছি!

—তা, আমি কি করব! তোমার বগলে কোড়া, তুমি সামলে রাখো।

—চুপ রও; হারামজাদী। চুলের মুঠি ধরে...

কথাগুলো সমবুধের কানকে অবিশ্বাসী করে তুললো। নিজেরই কথা তো! স্বতোৎসারিত! হ্যাঁ। কেননা, মধুষ্কা এবার চুপ মেরে গেল, কিন্তু ভিরমী খেল না। শুধু নিজের মাথায় হাত দিয়ে আত্মরক্ষার ভঙ্গীতে পোয়তি ব্যাঙের মত চিৎপাত হয়ে হাত পা ছড়াল। কোন কথা বললো না কোন কথা না। যেন ও কোনদিন কথা বলে নি। যেন ও কোন দিন কথা বলবে না। আর সমবুধ?

মধুষ্কার চুলের মুষ্টি ধরার জন্যে উদ্দত নিজেরই হাতটার দিকে প্রেমদৃষ্টিতে তাকাল সমবুধ। দেখল, ওর হাতের টান টান শিরাগুলো কেমন আল্‌গা হয়ে যাচ্ছে। হাতটা গতিপথ পাল্টে নিচ্ছে আঙুলগুলো যেন মহানন্দে মধুষ্কার যাট ওয়াট বাল্বের মত বুকের দিকে এগিয়ে যেতে চাইছে। আর সমবুধের মস্তিষ্কের উত্তেজিত স্নায়ুগুলো আস্তে আস্তে থিতিয়ে যাচ্ছে। আর ওর হাতটা ওর এই মুহূর্তের ইচ্ছের সাথে মিলেমিশে মধুষ্কার মাথার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। একটা আল্‌তো কবুতরী আদরের ছোঁয়া দেবার জন্যে, একটা উসখুস প্রেমের সোহাগমুখ অনুভব করার জন্যে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ওর বাড়িয়ে দেওয়া হাতের বগলের নীচে বীজগুঁড়ি কোড়াগুলো নড়ে চড়ে উঠল আর ওর ল্যাটিনটা সারা দেহে একটা আশ্চর্য ব্যাথার ঝনাৎকার তুলল। আঁৎকে উঠল সমবুধ। বিদ্যুতাহতের মত চমকে থমকে শরীরে শরীরে নীল হয়ে গেল। আর তাই না দেখে মধুষ্কার মাথায় সন্ত্রস্ত উকুন-গুলো হো হো করে হেসে উঠল। হো হো হো। সে কি হাসি রে ভাই। যেন আচম্‌কা টপ করে সাজঘরের পর্দাটা খুলে গেছে আর উলঙ্গ রাজা এটা ওটা টেনে লজ্জাঙ্গ ঢাকার চেষ্টা করছে। হাঃ হাঃ হাঃ। উকুনগুলো হাসতে থাকল। হাসতে থাকল। হাসতে হাসতেই বলে উঠলো,

—গুড নিউজ। শুভ সংবাদ। গুড নিউজ।

—কি সংবাদ?

—মধুষ্কার বাচ্চা হবে। মধুষ্কার বাচ্চা হবে। মধুষ্কার...

—তা তো হবেই। এ আর এমন কি সংবাদ দিলে বাবা! এ তো সবাই জানে!

—কিন্তু, তুমি তো জানতে না!

—নাঃ। আমি জানি না। বোঝো ঠ্যালা!

—তুমি জানতে?

—আলবাৎ জানতাম।

—তুমি জানতে, মধুষ্কার মাথায় উকুন?

—নিশ্চই জানতাম।

—তুমি জানতে ওর মাথার উকুনগুলো কোত্থেকে এলো?

—কোত্থেকে?

—জানতে না তো! আন্তর মাথা থেকে।

—খুব জানতাম।

—ওম্‌নি, ওম্‌নি চপ্‌ দিচ্ছ!

চপ্‌ দিচ্ছি! শ্লা মারব ঝাঁপড়, বাপের নাম ভুলিয়ে দেবো, শুয়ারের বাচ্চা।

—আমরা শুয়োর নই, আমরা উকুন; আমাদের বাচ্চা নেই, আমরা একা। আমরা শুয়োর নই, আমরা একা; আমাদের বাচ্চা নেই, আমরা উকুন। আমরা.....

—আবার, আবার রেলা হচ্ছে। ভাগ্‌। ভাগ্‌ শ্লা। বলে সমবুধ এক তাড়া মারল। আর উকুনগুলো,...আমরা উকুন। আমাদের...'বলতে বলতে মধুঝার স্কালে মিলিয়ে যেতে থাকল। আর সমবুধ? রাগ আর দুরন্ত ঘেউড় ছাপিয়ে সমবুধের মনে পড়ল; সত্যি তো! মধুঝার মাথার উকুনগুলো কোত্থেকে এলো! কোত্থেকে। সত্যি কি আস্তর মাথা থেকে? নাকি...ভাবতে ভাবতে সমবুধ একটু হাত পা ছড়ানোর চেষ্টা করল, আর সেই সঙ্গে ওর বগলের ফোড়াগুলো টাটিয়ে উঠল। মস্তিষ্কের স্নায়ু উত্তেজিত হয়ে উঠল। আবার রেগে গেল সমবুধ। সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল ঐ উকুনগুলোর ওপর। বলল,

—শ্লা, উকুন কি বাচ্চা! বাপের ব্যাটা হ'স তো বেরিয়ে আয়। সব সালাকে 'গোলি সে উড়া দুঙ্গা'।...

কিন্তু সমবুধ কাউকে 'গোলি সে' উড়িয়ে দিতে পারবে না, অন্তত এখন তো নয়ই। কারণ যদিও সমবুধের একটা বন্দুক আছে, কিন্তু টোটা নেই। তখন, সেই স্বদেশী আমলে একটা বন্দুক রাখার মধ্যেই ছিল কি ভীষণ উত্তেজনা আর সন্ত্রাস! কি উন্মাদ ভয় ভাবনা! অথচ এখন, এখন তো মানুষের কাটা ফুসফুস থেকে অহরহ পিচ্‌কিরির মত রক্ত ঝরছে। অথচ কে কাকে মারছে? কেন মারছে? উত্তর নেই। শুধু হিংসের বদলে পিস্তলের নল আর প্রতিশোধের বদলে টোটা। এসব জানে না সমবুধ, এসব চায় না। তাই ওর বন্দুক আছে টোটা নেই। না থাকাই শ্রেয়। তবু সমবুধ রেগে যায়। কাণ্ডজ্ঞানহীন রেগে যায়। যার কোন মানে হয় না। যার কোন অর্থ নেই। তাছাড়া ভদ্রতা বলেও তো একটা জিনিস আছে! এই তো সেদিন মধুঝার বিয়ে হল। এই তো সেদিন। এর মধ্যেই অ্যাতো ঝাঁঝ। অ্যাতো তেজ! অ্যাতো সূর্য! অ্যাতো হাইড্রোজেন! অ্যাতো

হিলিয়াম! ভাবল সমবুধ। তারচে' নিয়নের মত নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকাই ভাল। একেবারে জিরো গ্রুপের একঘ'রে ইনার্ট ফ্যামিলি মেম্বার। কারো সাথে কথা নেই, মেলামেশা নেই, লোক লৌকিকতা নেই, ভাব ভালবাসা নেই; আদর আবদার নেই। শুধু নিজেরটি বোঝা, খাও দাও আর বগল বাজাও। কিন্তু বগল বাজাবে কে? সমবুধের হয়ে বগল বাজাবে কে? আর সমবুধের আছেই বা কে? থাকার মধ্যে এক মধুঝা। কিন্তু মধুঝা তো আর সমস্ত হারা জলাঞ্জলি দিয়ে মহাভারতী দ্রৌপদীর মত হা হা করে বগল বাজাতে পারে না! কারণ মধুঝা এখন স্ত্রী। সম্ভ্রান্ত পত্নী যাকে বলে। আর সমবুধ? বেচারা সমবুধ। ওর বগলে একঝাঁক ফোড়া, খিকখিকে মৌচাকের মত ফোড়া। বগল নড়াতেই পারে না, তার বাজানো। তাহলে, তাহলে বগল বাজাবে কে? কে বগল বাজাবে। ভাবছিল সমবুধ। চুপচাপ ভাবছিল। আর ঠিক তক্ষুণি মধুঝা শান্তগলায় বলে উঠল,

—আস্তদা বেশ আছে, না? কেমন খায় দায় আর বগল বাজায়।

—কে? আস্ত! যার নাকি নাকের রেলগাড়ী সিগ্‌নি ছিল জিব অব্দি আর ইজেরের দড়ি ঝুলত হাঁটুতে? ছোঃ!

—তুমি দেখেছ এসব?

—না, দেখিনি; তবে···

তবে, আস্তকে অন্যভাবে দেখেছে সমবুধ। বেশ স্পষ্ট তার কাছাকাছি দেখেছে। বেশ মেলামেশা করেই দেখেছে। ওইতো বন্ধু ছিল একসময়ে। একেবারে অন্তরঙ্গ যাকে বলে। তারপর আস্তে আস্তে দূরে সরে যাওয়া। নিজ নিজ ক্ষেত্রের কেন্দ্র গড়ে নেওয়া। যেমন আস্ত। আস্তর পঁচিশে বিয়ে, ছাব্বিশে একটা ফুটফুটে শিশুপুত্রের বাবা। বৌটা আর্যন জাতীয়, একেবারে জিরো গ্রুপের ইনার্ট ফ্যামিলি মেম্বার। আর আস্ত ওর আর্যন বৌটাকে বাচ্চাশুদ্ধ দেয়াল বন্দী করে দিব্যি লোহা বেচে মুনাফা লুটছে। এসব তো দেখছে সমবুধ। ভাবল ও। তাহলে, তাহলে আস্ত বগল বাজাবে না, তো, কে বাজাবে। ঠিকই বলেছে মধুঝা। আস্ত বেশ আছে। খায়-শোয় আর বগল বাজায়। লোহা বেচে, নাফা লোটে আর বগল বাজায়। বাজাবেই তো। বাজাবে না।

—বাজারে। বগল বাজা। একবার বলেছিল সমবুধ। শুনে আস্ত বলেছিল,

—তুই কি করছিস রে বেটা? ল্যাটিস ফুলিয়ে শুধু ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছিল। কিছু কর। বুনো ষাঁড়ের মত ঘোঁৎঘোঁৎ করে কি হবে।

কি যে হবে তা জানে না সমবুধ। জানলে এতদিনে একটা কিছু করে ফেলত সমবুধ। অন্তত ছোটখাট একটা জুয়োচুরির ব্যবসা। নিদেনপক্ষে চোরাই অস্ত্রশস্ত্র এদিকওদিক করে দুচার লাখ গুছিয়ে নিতে পারত। এ লাইনটা ওর জানা ছিল। তখন, সেই স্বদেশী আমলে এসব কম তো করেনি। বারুদ বন্দুক নিয়ে চোরাগোপ্তা পথে পদ্মার এপার ওপার করে বহু কাল বিপ্লবীদের হাতে তুলে এনে দিয়েছে। তখন সে কি উত্তেজনা আর আতঙ্ক। এখন তো অতো সব করতে হয় না। দুচার পয়সা এদিকওদিক ঠেকিয়ে দিলেই মাল পার। কিন্তু এসব করতে পারে না সমবুধ। করতে পারবে না। তার প্রথম এবং প্রধান কারণ, আন্তর বগল বাজান দেখে ওর রাগ কিম্বা হিংসে কিছুই হয় নি কোনদিন। হয়ও না। বরং আন্তর ছোট্ট শিশুপুত্রটাকে দেখে সমবুধের পিতৃত্ব (কিম্বা বাৎসল্য, যাহোক একটা কিছু) হড়হড় করে উথ্‌লে উঠত। আর আন্তর আর্গন বৌটাকে দেখে ওর বগলের কোড়াগুলো টাটিয়ে উঠত। লজ্জায় সিঁটিয়ে যেত একেবারে। তাই না দেখে আন্ত হঠাৎ হঠাৎ বলত,

—কিরে বেটা, খুব তো ল্যাটিস ফুটিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস! কি ব্যাপার কি!

—ল্যাটিস আর কোলালাম কৈ? ল্যাটিস তো গুটিয়ে সিঁধিয়ে যাচ্ছে। দেখছিস না কিরম ধক্কেলের মত কুঁজো মেরে যাচ্ছি। দুদিন বাদে একটা নিঁখুত "?" হয়ে ঘুরে বেড়াব। সুযোগ মত যে কোন সেন্টেন্সের পাশে গিয়ে লটকে গেলেই হল। ব্যস! নাও, তখন সামলাও। কি, কেন, কোথায়, কবের ধাক্কা সামলাও—

আন্ত হয়ত এসব কথা শুনতো কিম্বা শুনতো না। বেয়াড়া ভঙ্গীতে বলে উঠত,

—আরে ওসব ছাড়। আঁতলেমি করে কিস্যু হবে না। আপনা ধান্ধা কর। সংসার ধম্মো কর। হ্যাঁ ওখানে ঢুটন। গাড়ী গলির পেছনে আছে। লোড করে দে। আর বলে দে, চালান হবে না। এক বাণ্ডিল বিড়ি নিয়ার তো গোপাল। হ্যাঁ, যা 'বলছিলাম'....

—তার মানে? তারমানে, মধুষ্কা বছর বছর বিয়োবে আর, আমি বিড়ি

মুখে টন টন লোহা বেচে মুনাফা লুটব। ধুর! ওসব আমার দ্বারা হবে না। তারচে' আমার স্বদেশী আন্দোলনই ভাল। বীরমোহনবাবুর মত সত্তর বছর বয়সে প্রস্টেটগ্ল্যাণ্ড ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে মূত্রনালী বন্ধ করে দেবো আর কিডনী থেকে ক্যাথিটার লাগিয়ে দিব্যি মাসে মাসে স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেন্সেন গুণব।

—কিন্তু বীরবাবুকে দেখেছিস! কি অবস্থা হয়েছে। প্র্যাকৃটিক্যালি এখন তো ওঁর লিঙ্গের কাংসান, মিল।

—হ্যাঁ রে ইস্! কি দুর্ভোগ, তাই না?

এইসব বিচ্ছিন্ন সংলাপগুলো হুটোপুটি করছে সমবুধের মনে আর বুকের মধ্যে ফ্যাকাসে অন্ধকার। পাশে শুয়ে আছে মধুষ্কা। তার মানে, কোমার মত পড়ে আছে। নট নড়ন চড়ন, নট কিচ্ছু। পিত্তেশ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল সমবুধ। তিল তিল করে খুঁজে দেখল মধুষ্কার আগা-পাশ-তলা। খুঁজে খুঁজে দেখল। কোথাও কোন পাবার সম্ভাবনা আছে কিনা। কোথাও কোন হচ্ছে। কিন্তু নাঃ। কিছু নেই। কিছু না। আর ঠিক সেই মুহূর্তে নড়ে উঠল মধুষ্কা। যেন ডিলিরিয়ামে প্রলাপ বকে উঠল,

—আন্তদাকে আমার দারুণ ভাল লাগে।

কান খাড়া করে শুনল সমবুধ। চৈতন্য সটান করে অনুভব করল কথাগুলো। আর ভাবল, হ্যাঁ, তাতো লাগবেই। লাগবে না। আন্তর যে এখনো পৌরুষ খোয়া যায় নি। টাকার অঙ্ক যত বাড়ছে, ততই খোলতাই হচ্ছে ওর পৌরুষ। আর এই পৌরুষ! পৌরুষ মানেই তো সব। আসলে, ম্যাথেমেটিক্যালি বলতে গেলে, B ম্যান (M) ইজ কমপ্লিটলি আ ফাংসান অব পৌরুষ (P)। অর্থাৎ $M=f(P)$ তাকে ডিফারেন্সিয়েট কর, দ্যাট ইজ, $\frac{dM}{dP}$ = ল্যাংবোট, লেজুড়, ইত্যাদি। (গণিতজ্ঞেরা নিশ্চই আমার সঙ্গে মতানৈক্যে যাবেন না।) ভাবল সমবুধ। আর মনে মনে বলল,

—জান মধুষ্কা, এটাই কথা। এইই সব। কিন্তু, কিন্তু এই যে ডিফারেন্সিয়েটিং প্রোডাক্ট, দ্যাট ইজ ল্যাংবোট লেজুড় ইত্যাদি, এরা কিন্তু আর স্বদেশী করবে না। কারণ এখন তো দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। অর্থাৎ আর তো কোন সংগ্রাম নেই, সংঘর্ষও না। সুতরাং কোন আত্মাহুতি নেই, আত্মবলিদান নেই, দেশপ্রেম নেই, শৌর্যবীর্য নেই; কিন্তু, কিন্তু অহিংস

আছে এবং অসহযোগ তো আছেই, প্রকট ভাবে আছে। যেমন দ্যাখো, তোমার সাথে আমার কি দারুণ অসহযোগ। আস্তর বৌট, ঐ যে আর্গন জাতীয় জিরো গ্রুপের বৌটা ওর সাথে আমার অসহযোগ। আর, আর বীরবাবুর সাথে সকলের অসহযোগ। (বেচারা বীরবাবু)। আর তাছাড়া আস্তর সাথে আমার কোন অহিংসা নেই, তোমার সাথেও না। (তার মানে কি, হিংসা আছে; হয়ত আছে কিম্বা...)। আর দ্যাখো, তোমার মাথার উকুনগুলো আর আমার বগলের ফোড়াগুলো কি ভীষণ অহিংস আর পরস্পর অসহযোগী। অথচ, অথচ আমরা কেমন মিলেমিশে আছি। সবাই সবার সাথে। সবাই সবার মত। সবাই এক। সবাই একক। সবাই বহু। আস্ত এক। আস্ত একা। আস্ত বাহু। আমি এক। আমি একা। কিন্তু আমি বহু নই। বহুর মধ্যে এক। বহুর মধ্যে একক। অস্তিত্বে বা অনস্তিত্বে একক। সত্তায় বা সত্তাহীনভাবে একক। বহুর মধ্যে একক। অন্তত তিনজনের মধ্যে একক। তিনজনের মধ্যে একা। একা। মধুষ্ণা এসব কথা শুনল কিম্বা শুনল না। ডিলিরিয়ামে বকে ওঠার মত বলে উঠল।

—আমরা, আমি, তুমি আর আস্তদা এক হতে পারছি না। তিনজনে তিনজন হয়ে আছি। ত্রিমুখি হয়ে আছি।

—ত্রিমুখি না, ত্রিমুখি না মধুষ্ণা; ত্রিভুজ হয়ে আছি, ত্রিভুজ। ক্রমশ ছোট হতে থাকা একটা ত্রিভুজ। আমি তুমি আর আস্ত। তুমি আমি আর আস্ত। শুনে মধুষ্ণা নাকমুখ কুঁচকে ওয়াক তুলল। সমবুধ লক্ষ করল মধুষ্ণাকে। বাণদৃষ্টি দিয়ে ফালা ফালা করে লক্ষ করল মধুষ্ণার ভেতর থেকে উঠে আসা ব্যথা আর ঘৃণা, লক্ষ্য করল নৈঃসঙ্গ আর কান্না; আর স্পষ্ট অনুভব করল মৃদু আর হিমশীতল নির্জনতা। আলতো হাত দিল মধুষ্ণার তলপেটে। আলতো হাত বুলিয়ে দিল। মধুষ্ণা কোন কথা বলল না, নড়ল না, হ্যাঁ-হুঁ—চ্যাঁ-ক্যাঁ কিছু করল না। কোমার মত পড়ে রইল আর আস্তর কথা মনে পড়ল সমবুধের। আস্তর সেই কথাগুলো, সেই যুক্তিগুলো।

দ্যাখ, ত্রিভুজ মানে তিনটে ভুজ অর্থাৎ বাহু। তিন বাহু। তারমানে যে কোন ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করতে গেলে তিনটি বাহু দরকার। অবশ্যই ঋজু বাহু। দুটো বাহু দিয়ে নিশ্চয়ই হয় না। জ্যামিতি তো তাই বলে। তাই না?

—কিন্তু, দ্যাখ, আমি তো আমার দুটো দৃঢ় ও ঋজু বাহু দিয়ে মধুষ্ণাকে

বহুবার সীমাবদ্ধ করেছি। এটাকে তুই জ্যামিতি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারিস? এই যে, মধুষ্ণার স্তনবৃন্ত, মধুষ্ণার যৌনিক ত্রিভুজ, মধুষ্ণার সৃষ্টি-গ্রাহ্য মধ্যমা, এগুলো, এগুলো কি জ্যামিতি থেকে ছাড় পেয়ে গেল? শ্লা পিথাগোরাস। শুধু সমুদ্রের বালি আঁচড়ে গাদা গাদা থিওরেম তৈরী করল, এসব আর মাথায় এলো না। গেঁড়ে কোথাকার।

—আসবে কি করে? পিথাগোরাসের তো আর মধুষ্ণা ছিল না। আর মধুষ্ণা থাকলেও আস্ত (নিজেকে দেখিয়ে আস্ত বলল) ছিল না। আর আস্ত থাকলেও বগলে ফোড়া ছিল না। আর বগলে ফোড়া থাকলেও উকুন নিশ্চই তখনও আবিষ্কার হয় নি...

—কিন্তু, আমরা তো ওর পিথাগোরাস পড়ি, কেনি পড়ি, স্কট পড়ি, ডিকেন্স পড়ি আর আর্যভট্ট ওড়াই আর...

—আর স্বামীকে থোড়াই কেয়ার করি, এই তো!

—অথচ আমরা সবাই এক। আশ্চর্য। আমি, তুই, তোর আর্গন বৌ, আমার আর্য মধুষ্ণা; সবাই, সবাই এক। এক এবং একক...

—আর বীরবাবু?

—বীরবাবু মারা গ্যাছেন।

—কি?

—কাল স্বাধীনতা দিবস।

—কি?!

—আমি স্বদেশী করব।

—কি কি??!!

—মধুষ্ণার বাচ্চা হবে।

—কি???!!! বলে আস্ত এমন নাক সিঁটকালো যে ওর তেল চুকচুকে মাথার চুলগুলো বেগুনকাঁটার মত খাড়া হয়ে গেল। আর ওম্নি সুযোগ বুঝে ওর মাথার উকুনগুলো হো হো করে হেসে উঠল। হো হো হোঃ। সেকি হাসি রে ভাই; যেন এই মুহূর্তে গ্রীণরুমের দরজা হাট হয়ে খুলে গ্যাছে আর নট-নটীরা নিজেদের কাছ থেকে নিজেদের আড়াল দিচ্ছে। উকুনগুলো হাসছে। হাসতে হাসতে বলে উঠল,

—টেলিগ্রাম। টেলিগ্রাম। টেলিগ্রাম।

—কিসের টেলিগ্রাম ভাই।

—আস্তর লোহায় মরচে ধরেছে। আস্তর লোহায় মরচে ধরেছে।

—তাই নাকি! ইস্! বলে সমবুধ কি যেন খুজতে লাগল। অন্ধকারের মধ্যে হাঁতড়ে হাঁতড়ে খুজতে লাগল। কি যেন পেয়েছি ভাব। কি যেন পুনরুদ্ধারের অনুভূতি। কিন্তু কিছুই পেল না। হঠাৎ আচমকা

মধুঝার গায়ে হাত পড়ল। কোমার মত পড়ে ছিল ও। হঠাৎ ডিলিরিয়ানে বকার মত বলে উঠল,

—আন্তদাকে আমার দরুণ ভাল লাগে।

—আমারও।

—তোমার বগলের ফোড়াগুলো সেরে গ্যাছে?

—একদম। বলে ল্যাটিম ফুলিয়ে দাঁড়াল সমবুধ। মধুঝার চুলের মুঠি ধরে আদর করল খুব একচোট। আদরের চোটে সদ্যমুক্ত সূর্যের মত ফ্যাল্‌ফ্যা ল্‌ করে হলুদ চেয়ে রইল মধুঝা। আর তক্ষুনি ওর টর্চের বাল্বের মত চোখ থেকে টপ্‌ টপ্‌ করে মরা উকুন ঝরে পড়তে থাকল। সমবুধ দেখল। স্পষ্ট দিনের মত দেখল সমবুধ মরা উকুনগুলো আর তাদের দুড়দাড় ঝরে পড়া। দেখতে দেখতে সমবুধের চৈতন্যে একটা হিমবাহ বয়ে যেতে লাগল! একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা। অসহ্য। অস্ফুট। চীৎকার করে বলতে চাইল ও।

—না, না মধুঝা, না। আমি চাই না। আমি এসব চাইনা। আমি রক্ত চাই মধুঝা, রক্ত। আই নীড ব্লাড। ব্লাড ফর ব্লাড। রক্তের বদলে রক্ত। সূর্যের মত রক্ত। হাইড্রোজেন-হিলিয়ামের মত রক্ত। রথাশ্বের মত রক্ত। জলন্ত মুক্তোর মত রক্ত। আই নীড ব্লাড, মধুঝা, ব্লাড; ব্লাড ফর ব্লাড। রক্তের বদলে রক্ত...

কিন্তু তখনো মধুঝা অদ্ভুতেজ কোমার মত পড়ে রইল। চ্যাঁ-ফু কিছু করল না। হ্যাঁ-না কিছু না। ভোঁস ভোঁস করে ঘুমুচ্ছে মধুঝা। কোমার মত পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে। কোন কথা বলছে না। যেন ও কোনদিন কথা বলেনি। যেন ও কোনদিন কথা বলবে না। অথচ...

কিড্‌নী টান হয়ে আছে সমবুধের। সারারাত পেচ্ছাব জমেছে ব্লাডরে। ব্লাডার উপ্‌চে কিড্‌নীতে। কিডনী থেকে স্নায়বিক যোগাযোগে মস্তিষ্কে। মস্তিষ্ক পীড়া দিচ্ছে সমবুধকে। পীড়া দিচ্ছে কিডনী। উঠে বসল সমবুধ। আস্তে আস্তে বাথরুমে গেল। কিডনীতে জমে থাকা সারারাতের পেচ্ছাব পরিষ্কার করে ট্যাপের মুখে ক্যাথিটারের নলটা ধুতে ধুতে নিজের অসাড় পৌরুষটা একবার হাত দিয়ে দেখে নিল। রোজই এভাবে ও ওর পৌরুষটা একবার করে দেখে নেয়, কারণ এখন তো ওর লিঙ্গের কাংসন, NIL শূন্য।

আসলে জীবন

অশোক পোদ্দার

ছেলেবেলা হতে অমল শুনে আসছে পড়াশোনা না করলে বড়ো হওয়া যায় না। অমল তাই মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করেছে। পড়াশোনা না করলে বড়ো হওয়া যাবে না। বড়ো না হলে চাকরি পাবে না। চাকরি না পেলে খাওয়া জুটবে না। খাওয়া না জুটলে অমল মরে যাবে। অমলের কোন নেশা নেই। অমলের কোন বন্ধু নেই। অমলের কোন হবি নেই। অমল সিনেমায় যায় না। অমল থিয়েটারে যায় না। অমল কোথাও বেড়াতে যায় না। অমল দিনরাত ঘরে বসে পড়াশোনা করে।

ভালভাবে বি. কম পাশ করলো অমল। অমল গ্র্যাজুয়েট। অমল চাকরি করবে। অমলের বাবা বললো ব্যাংকে যা। অমলের মা বললো রাইটার্স ঘুরে আয়। অমলের কাকা বললো পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের চাকরী ভালো। অমলের বোন বললো এয়ার লাইনস্‌। বাবা কি মজা!

অমল চাকরির খোঁজে গেল। ইউনাইটেড ব্যাংক। না—নেই। এলাহাবাদ ব্যাংক, কিছুদিন বাদে খোঁজ নেবেন। অমল রাইটার্সে গেল। কাকা—মামা আছে? অমল এয়ার লাইনস্‌এ গেল। লোক ধরুন মশাই, লোক ধরুন—মন্ত্রী জাতীয় লোক ধরুন। অমল হ্যারীসন এণ্ড কোং-এ গেল। কতটাকা ঘুষ দেবেন? অমল বাড়ি ফিরে এলো। বাবা বললো কি হলো? মা বললো চাকরি বাকরি করার ইচ্ছে নেই? কাকা মামা বললো তালে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরগে যাও। বোন বললো, ডোণ্ট ওরি—চাকরি পাবিই। পরদিন কর্পোরেশনে গেল। এখানে চাকরির চাষ হয় না। তারপর দিন রেলে গেল। ক্লার্ক নিচ্ছে অ্যাপ্লাই করুন।

অমল অ্যাপ্লাই করলো। বাবা বললো—হবে তো? মা বললো কালী-ঘাটে পুজো দেবো। মামা-কাকা বললো না হলে কার হবে? বোন বললো—হাই গড্‌।

রেল হতে আর উত্তর আসে না। বাবা বললো—কি হলো? মা বললো, আমার আর ভালো লাগছে না। মামা-কাকা বললো—এম. কম পড়ে নে। বোন বললো, ব্যাঙ্কিং চাই ব্যাঙ্কিং। অমল বাড়িতে বসে রইল।

বাবা বললো, অপদার্থ, মা বললো, খালি খায় আর ঘুমোয়। মামা-কাকা বললো, টাকা পয়সা সব জলে গেল। বোন বললো, ক্যালিবার নেই।

অমল জ্যোতিষীর কাছে গেল। জ্যোতিষীর দশ টাকা ফি। জ্যোতিষী অমলের ঠিকুজী দেখলো। বার বার হাত টিপে দেখলো। শনি খারাপ। নীলা না নিলে চাকরি হবে না। ইন্দ্রনীল পাঁচ রতি।

অমল বাবার কাছে গেল। নীলা নিতে হবে। বাবা বললো, টাকা নেই। মার কাছে গেল। মা বললো, মরবার সাধ হয়েছে? মামা-কাকা বললো, ওতে কিস্সু হয় না। অমল বোনের কাছে গেল না। বোন এসে বললো, তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

অমল একজন আই. এ. এস. অফিসারের কাছে গেল। আই. এ. এস অফিসার অমলকে চেনে না। কুকুরের মত তাড়িয়ে দিল—যাওওও!

অমল ব্যবসা করবে। বাবা বললো, আমি টাটা বিড়লা নই। মা বললো, জমানো সোনা দানা নেই। মামা কাকা বললো বোকা কোথাকার। বোন বললো—দাদার কোন বুদ্ধি শুদ্ধি নেই।

অমল রাজনীতি করবে। রাজনীতি করলে চাকরি হয়ে যাবে। বাবা বললো মার্ডার হয়ে যাবি। মামা কাকা বললো, বিপজ্জনক। বোন বললো—ও কথা মুখে আনিস না। মা বললো তোকে কি এজন্য মানুষ করলাম?

অমল সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। বাবা বললো বুড়ো বয়সে আমায় কষ্ট দিবি? মা বললো, আমি তা হলে আর বাঁচবো না। মামা-কাকারা বললো ছিঃ ছিঃ। বোন বললো, এসকেপিস্ট।

অমল এখনো বেকার। খায় দায় আর অফিসে অফিসে চাকরির জন্য ঘোরে। প্রতিদিন বাবা মার গালাগাল শোনে। চাকরির জন্য পড়াশোনা। চাকরির জন্য বিয়ে। চাকরির জন্য ছেলে মেয়ে ঘর সংসার। যখন চাকরি থাকে না...। তাহলে জীবন...। অমল আকাশের দিকে মুখ তুলে ঈশ্বরকে গালাগালি করতে চাইল, করল না। বদলে—বাবা...মা...মামা.... কাকা...বোন... এমন কি নিজেও!

———

পোস্টমর্টেম

সুবীর দাস

আমার মৃত্যু হলো।

আমি শ্রী অজিত গুপ্ত আজ থেকে মৃত।

ডাক্তারী রিপোর্ট অনুযায়ী সেরিব্রাল এ্যাটাক। সময় সকাল আটটা বেজে চল্লিশ মিনিট।

সে কি! বয়স তো বেশী হয় নি!

না। মাত্র বিয়াল্লিশ।

বহু পরিচিত অপরিচিত অল্প-পরিচিত লোকের উত্তরে এইটুকু শুধু বলা যায়।

অবশ্য চমকটা আমারও ছিল। এভাবে যে হুম করে মরে যাব এ আমার ধারণারও অতীত। দুর্বল আমি বেশ কয়েক বছর যাবৎ হয়ে পড়েছিলাম সত্য, কিন্তু, এতটা ক্ষয় যে ভেতরে ভেতরে হয়ে গেছে তা ভাবতেই পারিনি।

গতরাত্রে শরীরটা একটু বেশীই খারাপ করেছিল। শরীরে কোন শক্তি ছিল না। পেটের মধ্যে একটা অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল। এবং স্বভাবমত কাউকেই কিছু বলি নি। আর কাকেই বা বলব? কে আছে আমার আপন? একমাত্র মা। বাকী সকলেই রক্তের সম্পর্কে ভাই-বোন মাত্র। আন্তরিকতায় শূন্য—অঙ্কের নিয়মে।

তাই কাজ থেকে ফেরার পথে পাড়ার মোড়ে কবিরাজী এ্যালোপাথি, হোমিওপাথি মিক্সড ডাক্তার অনিলবাবুর কাছে একবার গিয়েছিলাম।

—খুব যন্ত্রনা হচ্ছে?

—হ্যাঁ ভীষণ।

—আপনাকে আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি—আপনি এত বেশী খালি পেটে থাকবেন না। খালি পেটে বেশীক্ষণ থাকার ফলে পেটে এ্যাসিড ফর্ম করছে আর তার থেকেই এই ভয়ঙ্কর আকৃতির গ্যাসট্রিক...

ডাক্তারবাবুকে কি করে আর বলি যে খালি পেটে কোনো মানুষই শুধু শুধু থাকেনা। অক্ষমতাই মানুষকে খালি পেটে থাকতে বাধ্য করে। কিন্তু বলিনি। কারণ জানি এসব কথা বলার কোনো মানে হয় না। ভোলানাথ

বাবুর অফিসে কাজ করে পাই দুশো টাকা। সকাল ন'টা থেকে রাত্রি সাতটা তো বটেই—আবার কখনো দরকার পড়লে নটাও হতে পারে, এরকম এক অদ্ভুত ডিউটি। যে ডিউটির ব্যাপারে আমার কিছুই বলবার নেই। কারণ মাত্র বছর চার হলো মেজদা তার জানাশুনো ভোলানাথ বাবুকে বলে ক'য়ে এটা করে দিয়েছে। যদিও মাইনে বাড়াবার জন্য বলেছিলাম, কিন্তু হবে হবে করেও হয় নি। এছাড়া রোজগারের আরও দুটো পথ ছিল। এক : ট্যুইশনি। দুই : বাড়ীভাড়া। কিন্তু ইদানীং ভ্রাতৃ বিরোধের ফলে বাড়ীভাড়ার টাকা জমা পড়ে রেণ্ট-কণ্ট্রোলের অফিসে। কেউই পায় না। সুতরাং আমারও হাতে আসে না কিছুই। অর্থাৎ সাকুল্যে দুশো সত্তর টাকা। এতে কখনো দুটো মানুষের পেট চলে?

তাই ডাক্তারবাবুর কথায় নিজের মনে মনে একটু হেসেছিলাম। এবং মুখ গম্ভীরই ছিল। কেউ ভেতরটা বোঝেনি।

তারপর রাত্রের খাওয়া-দাওয়া সেরে ওষুধটা খেয়ে যথারীতি শুয়েও পড়েছিলাম। কিন্তু প্রায় বারোটা নাগাদ এমন পেটে যন্ত্রণা হতে শুরু করল যে অসহ্য ঠেকল। মাকে ডাকলাম।

—একটু মেজদাকে ডাকবে?

—এত রাত্রে? ওরা বোধহয় শুয়ে পড়েছে।

—না, যদি কোনো ভাল ডাক্তারকে একবার খবর দেওয়া যেত...

—তুই ডাক্তারবাবুর কাছে যাস্ নি?

—হ্যাঁ গেছি! কিন্তু এখন...

—খুব কষ্ট হচ্ছে?

কোনো উত্তর দিই নি। শুধু যন্ত্রণায় মুখ বেঁকিয়ে শুয়ে ছিলাম পাশ ফিরে। চিৎ হয়ে শুতে পারছিলাম না। একবার এপাশ, একবার ওপাশ করছিলাম।

মা একবার পেটের কাছটায় হাত বুলল। তারপর বলল, দাঁড়া দেখি ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে কি না। আমি একা শুয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। মনে মনে বললাম উঃ ভগবান, রক্ষা কর।

একটু পরেই মা ফিরে এল। বলল, ওদের ঘর তো অন্ধকার। এখন প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে। আর কি জেগে আছে?

তারপর আমাকে কাতরাতে দেখে বলল, তুই শো—আমি বরং একটু গরম তেল মালিশ করে দি বুকে। আরাম লাগবে।

আমার মার বর্তমান বয়স সাতষট্টি। সবল কিছুতেই বলা যাবে না। তবুও মা রা যেরকম প্রয়োজনে দুম করে সবল সচল হয়ে ওঠে সেরকম হয়ে উঠল আমার অবস্থা দেখে।

ঘরের এক কোণে থাকা হিটারটার সুইচটা অন্ করে তাতে একটা ছোট বাটী ভর্তি সরষের তেল বসিয়ে দিল দেখলাম। ভেবে পেলাম না মা কখন এর মধ্যে নীচে গেল তেল আনতে। কারণ ভাঁড়ার ঘর বা রান্নার ঘর যাই বলি না কেন ওখানে ছাড়া তো সরষের তেল পাওয়ার কথা নয়।

যাই হোক তার কিছু পর থেকে আমার বুকে পেটে পাঁজরের কাছে বেশ ঘষে ঘষে মা তেল মালিশ করে দিতে থাকল।

ওই অসহ্য যন্ত্রণাকাতর অবস্থাতেও আমার ভেতর একটা অসম্ভব রকমের লজ্জা মুখ লুকিয়ে রইল শারীরিক যন্ত্রণার কোলে। মনে হলো দুম করে একবার গৃহস্থ যত লোকেদের বউয়ের কথা। এমনকি তিন দাদাদের বিয়ের সময়কার ছবিও স্পষ্ট ভেসে উঠল।

আমি বিয়ে করিনি। বিয়ে করতে পারিনি। সামর্থে ঘাটতি ছিল। নিজের খরচই ভাল মত সামাল দিতে পারতাম না, সুতরাং আবার ভার-বোঝা বাড়াবার মত ইচ্ছে হলেও ক্ষমতায় কুলোয় নি। মা কয়েকবার চেষ্টা চরিত্র করেছিল, কিন্তু আমার অনিচ্ছায় তা আর জোরদার হয়ে ওঠে নি।

কিন্তু এখন মা-র হাত ক্রমাগত আমার শরীরে চলাচল করায় একটা ভাল লাগা আর একটা লজ্জা পাশাপাশি থমকে রইল।

মা বলল, ভাল লাগছে?

আমি ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বললাম।

তারপর হঠাৎ চোখ খুলতেই চোখ পড়ল বাইরের বারান্দার কাছে আমার ওপরের ভাই বা দাদা, যাকে আমি নাম ধরেই ডাকতাম, যার নাম অনিল, ওর বউয়ের সঙ্গে মুখ বাড়িয়ে দেখছে।

জানি ওরা আর কাছে আসবে না। এই কিছুদিন আগেও ওর সঙ্গে আমার হাতাহাতি মারামারি হয়ে গেছে। গত একবছর যাবৎ আলাদা খাওয়া-দাওয়া। যদিও এর বহু আগেই বড় দুই দাদাদের সঙ্গে ঝগড়া—পার্টিশন ইত্যাদি সমাপ্ত।

কিন্তু না, আমি দেখছি দেখে অনিল একবার আমার ঘরের কাছে এল। হয়ত এত রাত্রি বলেই মনে হয়েছে বিপদ।

তাই প্রশ্ন করল, কি হয়েছে?

মা বা আমি কেউ-ই কোন উত্তর দিলাম না। কারণ দুরকম। এক, কথা বলার অনিচ্ছা, অনভ্যাস। দুই, কার উদ্দেশ্যে যে ও কথাটা বলেছে ঠিক বোঝা যায় নি।

—ডাক্তার দেখিয়েছিলি?

তবু আমরা চুপ। আমরা, অর্থাৎ মা আর আমি। এবং আবার প্রশ্ন—বিশুবাবুকে খবর দেব? একবার আসবে?

এবার মা মুখ খুলল। বলল, থাক্ আর আদিক্ষেতা না দেখালেও চলবে। ছোট ভাই বলে তো এতদিন কত দেখলে—!

মার কথা বলার মধ্যে যথেষ্ট ঘৃণা আর বিদ্রূপ ছিল। কিন্তু আমার ইচ্ছে করছিল একবার বলি যে হ্যাঁ, একবার খবর দে। বড় কষ্ট হচ্ছে। যদিও মা-র কথা শেষ হওয়া মাত্রই অনিল আর দাঁড়িয়ে থাকে নি। ওদের ঘরের দরজা দড়াম শব্দে বন্ধ করে দিয়েছিল।

এবং প্রায় দেড়টা নাগাদ আমিও মাকে শুতে যেতে বলেছিলাম। ব্যাথাটাও একটু কমেছিল। যদিও মা আমার ঘরের মেঝেতেই একটা শতরঞ্চি পেতে শুয়ে পড়েছিল। আর প্রায় ভোর রাত অবধি মা আর আমি না-ঘুম না-জাগা করে কাটিয়ে দিয়েছিলাম।

তারপর যথারীতি সেই সকাল এসেছিল। আমার দেখা এই জীবনের শেষ সকাল।

ভোরবেলা একে বলা বোধহয় ঠিক হবে না। কারণ যখন ঘুম ভেঙেছিল তখন ঘড়িতে প্রায় সাড়ে সাতটা।

ঘরে মা ছিল না। নিশ্চই উনুন ধরানোর কাজে ব্যস্ত ছিল। যেরকম দৈনন্দিন হয়ে থাকে। কিন্তু আজ আমার পক্ষে বাজার যাওয়া, সকালের জলখাবারের জন্য পাঁউরুটি ইত্যাদি আনা একরকম অসম্ভব। হাঁটা চলার শক্তি তো দূরের কথা, আমার পক্ষে উঠে বসাও এখন একটা শক্ত কাজ বলে মনে হতে লাগল।

আমি চুপচাপ শুয়ে রইলাম। গতরাত্রের ব্যাথাটার বিশেষ হদিশ পেলাম না। আধো ঘুম, আধো জাগরণের মধ্যে সময় কাটতে লাগল।

একসময় চোখ বন্ধ রেখেও বুঝতে পারলাম মা ঘরে এসে আমায় দেখে গেল। কারণ মার গায়ের কাপড়ের গন্ধটা পেলাম।

কিন্তু আটটা নাগাদ পেটটা জোর মুচড়ে উঠল। প্রচণ্ড ব্যাথায় আমি ফের ককিয়ে উঠলাম। মনে হলো, পায়খানায় গেলে হয়ত একটু কমতে পারে। তাই অতি কষ্টে পাশ বালিশের ওপর হাত রেখে উঠে বসলাম। মাথাটা প্রচণ্ড ভারী ঠেকল। তারপর কোনোগতিকে দেয়াল ধরে নাধরে তিনতলা থেকে একতলায় নামলাম।

পায়খানায় লুঙ্গিটা খুলে আলনায় রাখতে যেতেই পা টলে উঠল। আমি পড়ে গেলাম। একটা ধপ্ শব্দ হলো। মনে একটা ভয়ও হলো—কেউ শুনতে পায়নি তো?

আমি আবার ওঠবার চেষ্টা করলাম। এবং উঠলামও। কিন্তু না—আবার পড়ে গেলাম। এবার হাঁটু গেড়ে পড়ার জন্য বেশ কিছুটা লাগল।

একটু সময় ধরে আর ওঠবার কোনো চেষ্টা করলাম না। চুপচাপ বসে রইলাম। পাছায় ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা লাগতে থাকল।

—কিরে কিছু হলো?

মা-র গলা। যা ভেবেছি তাই। ঠিক শুনতে পেয়েছে। এবং জল কলের শব্দ না পেয়ে ফের জিজ্ঞেস করল একই কথা।

শুধু বললাম—না।

তারপর হাত বাড়িয়ে কল খুলে দিলাম। শব্দ করে জল পড়তে লাগল।

আমার মনে হলো এখন এখান থেকে উঠে পড়াই শ্রেয়। কিন্তু একটা অদ্ভুত রকমের শ্রান্তি এবং দৌর্বল্য আমায় গ্রাস করে রইল। আমি নড়তে চড়তে পারলাম না।

তারপর একসময় বাধ্য হয়েই উঠে দাঁড়ালাম। কল বন্ধ করে পায়খানার দরজা ঠেলে বাথরুমের মধ্যে এলাম। আমাদের বাথরুম এবং পায়খানা একই সঙ্গে বলে আমার একটু সুবিধেই হলো। কোনোরকমে হাতমুখ ধুয়ে ফের লুঙ্গিটাকে পরতে গেলাম। আর তখনই বিপত্তি—

চোখের সামনে যেন কিছু নেই। ভাসা ভাসা সবকিছু। মাথাটা

ভীষণ ভার। যেন আমাকে আর আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। একবার মা বলে ডেকে উঠতে চাইলাম। কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। অথবা যেন আমিই বের করতে চাইলাম না। শুধু দেয়ালে হাত ধরে আস্তে আস্তে পড়ে গেলাম। পড়বার সময় চৌবাচ্চার কোণে মাথাটা জোর ঠুকে গেল।

শব্দহীন, উত্তেজনাহীন অবস্থায় পিঠে বাথরুমের ঠাণ্ডা নিয়ে আমি শুয়ে রইলাম।

আমার ডাকনাম দেবু। আর শুনতে পেলাম অতি ক্ষীণ স্বরে যেন মা বলছে—কি রে দেবু, শুনছিস? তোর কি হলো?

কি বলব আমি? আমার তো আর বলার ক্ষমতা নেই।

দরজায় বেশ কয়েকবার ধাক্কা পড়ল শুনতে পেলাম। দুম্ দুম্ শব্দ হলো। আর কানে একটা অদ্ভুত আওয়াজ যেন উড়ে উড়ে ঢুকতে লাগল।

—দরজা খোল। দেবু। দরজা খোল্।

কে খুলবে মা? ভেঙে তুমিই ঢোকো।

ক্রমাগত চিৎকার হতে হতে একসময় দরজায় জোর লাথি পড়তে লাগল। ছিটকিনিটা একটু একটু করে বেঁকে একসময় খুলেও গেল।

প্রথমে মা ঢুকল। পেছনে অনিল।

আমাকে পড়ে থাকতে দেখে মা একটু চমকালেও কর্তব্য রক্ষার জন্যই যেন লুঙ্গিটা আমার কোমরের ওপর ফেলে দিল। তারপর হাত ধরে টেনে উঠতে সাহায্য মত করল।

কিন্তু আমি যেমনকার তেমন।

অনিল বলল, কি রে, কি হলো?

তারপর আমার মুখ আর চোয়াল ফাঁক করে দেখতে লাগল। হয়ত ভেবেছে আমি বিষ-টিষ কিছু খেয়েছি। আর একথা ভাবাও কিছু অস্বাভাবিক নয় ওর, কারণ আমিও বহুবার ভেবেছি।

কিন্তু তেমন কিছু দেখতে না পেয়ে আর সাড়া পাওয়ার অভাবে উঠে দাঁড়িয়ে আমায় দেখতে লাগল। তারপর বাথরুম থেকে বেরিয়ে যাবার সময় মাকে কিছু একটা বলল। আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

এবং ফের মা কাছে এল। এবার আমার তুপায়ের ভেতর দিয়ে লুঙ্গিটাকে কোনো গতিকে ঢুকিয়ে দিল। কিছুটা নিজের মনেই বলল, এ আমার কি হলো বলো দেখি। এই দেবু, দেবু, সাড়া দিচ্ছিস না কেন? এই ওঠ—ওপরে চল্।

আমি আমার প্রায় বুজে থাকা চোখ একটু বেশী খুলে শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। মা-র চোখ মুখের দিকে তাকিয়ে একটা অদ্ভুত মায়া, সুখ, শান্তি এবং তৃপ্তি এসে মনের মধ্যে ভীড় করল।

মা ফের আমার গায়ে ধাক্কা মত দিয়ে বলল, এই দেবু—সাড়া দে। মেজদাকে ডাকব? কিন্তু, কোনোরকম উত্তর না পেয়ে এবার একটু হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল।

তারপর খুব ভাসা ভাসা শুনতে পেলাম আমাদের পাটিশন হয়ে যাওয়া বাড়ীর পাশে মেজদার ছেলের নাম করে ডাকছে মেজদাকে ডেকে দেবার জন্য। ডাকার মধ্যে একটা বিপদের সঙ্কেত ছিল। তাই মিনিট দুয়েকের মধ্যেই দেখলাম বাথরুমের মধ্যে মেজদা আর বড়দার ছেলে স্বপন ঢুকল।

—কি রে দেবু—কি হয়েছে—ওঠ্—

তারপর আমার কোনো উত্তরের আশা না করেই যেন স্বপনকে উদ্দেশ্য করে বলল—ধর—ধর—বাইরে নিয়ে চল।

এবং আমায় একরকম চ্যাংদোলা করেই বাইরে নিয়ে এল। তারপর উঠোনের পাশে দাওয়ার মতো জায়গাটায় শুইয়ে দিল।

এবার আর আমি চোখ খুলে তাকাতে পারলুম না। চোখ আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল। বুঝতে পারলাম চারপাশে বেশ একটা ছোটখাট ভীড় হয়েছে। মেজবৌদির গলাও যেন একবার শুনলাম। আর মেজদা দৌড়ে ডাক্তার ডাকতে চলে গেল।

যাবার সময় স্বপনকে বলে গেল—তুই এখানে দাঁড়া। নজর রাখ। বোধহয় ষ্ট্রোক হয়েছে।

মিনিট দুয়েকের মধ্যে ডাক্তারবাবু এল। সেই অনিল ডাক্তার। কারণ বোধহয় মেজদা জানত আমি এই ডাক্তারকেই দেখাই, তাই।

তারপর ডাক্তারবাবু আমার পাল্‌স দেখে, বুক পরীক্ষা করে একটু বেশীরকম ব্যস্ত হয়েও উঠল। কি একটা ক্যাপসুলের নাম করে যেন স্বপনকে বলল, এক্ষুণি নিয়ে আসুন।

স্বপনও ওষুধের নামটা আর একবার জিজ্ঞেস করে চলে গেল।

কিছু মেয়েলী গলার প্রতি এবার আমার মন গেল—পরিষ্কার বুঝতে পারলাম এরা আমার বৌদিরা এবং মা।

মা-র গলাটাই বেশী জোর শোনাচ্ছিল—কত করে বলি দেবু শরীরটার প্রতি একটু নজর দে। দুটো ভালমন্দ খা। কিন্তু আমার কথা কি কখনো শুনেছে? গোঁয়ার তো—যা মন করবে তাই। এখন কি হবে বল তো।

মেজবৌদি সান্ত্বনা দিতেই যেন বলল, আপনি কিছু ভাববেন না। ওরা সবাই আছে তো।

আমার হাসি পেল। ভীষণ হাসি পেল।

মনে মনে বললাম, কেউ নেই মেজবৌদি। প্রত্যেকে একা। শুধু কোনো মানুষ সাহচর্য বেশী পায়, কেউ বা কম। এইটুকু মাত্র।

কিন্তু ডাক্তারবাবু আমার বুকে তখন জোর ম্যাসাজ করে চলেছে। পেটের কাছে, পাঁজরের কাছে, হাতের তালু দিয়ে ঘষে ঘষে শরীরটাকে গরম রাখতে চেষ্টা করছে। আমার ভাল লাগা বা মন্দ লাগা যেন কিছু নেই। কষ্টও যেন উধাও। আমি অসাড় হয়ে শুধু শুয়ে রইলাম। আমাকে ঘিরে রইল আমারই মা বৌদি দাদা ভাইপো ভাইঝি-রা।

মা বলল, মুখে একটু জল দোব?

ডাক্তারবাবু বলল, দিন।

কিন্তু চোয়াল ফাঁক করে জল ঢাললেও তা গলায় ঢুকল না। সবটাই বেরিয়ে গেল। ডাক্তারবাবু তখন একটা ক্যাপসুল খাওয়াবার চেষ্টা করল।

আমার চোয়ালটা তখন যেন বেশীরকম শক্ত হয়ে গেছে। ভীষণ শক্ত। কিছুতেই তা ক্যাপসুল খাওয়ার মত ফাঁক হলো না।

তখন ওটা ভেঙে গুঁড়ো করে আমার মুখে ঢেলে দেওয়া হলো।

কিন্তু না—তাও জল মাখামাখি করে জিভ আর গালে লেগে রইল।

পেটে গেল না।

হঠাৎ বড়বৌদির গলায় শুনলাম কাউকে বলছে, কোনো বড় ডাক্তারকে যদি খবর দেওয়া যেত, একবার দেখনা.....।

হয়ত বড়দাকেই বলল। অথবা অন্য কাউকে। সে কথায় ডাক্তারবাবুও সায় দিল। বলল, হ্যাঁ ভাল হয়। আমি চেষ্টা করছি। আপনারাও দেখুন। বলে আমার বুক, পাঁজর সমানে ম্যাসাজ করে যেতে লাগল।

তখন কে কোথায় কাকে খবর দেবে কোন্ ডাক্তারকে এরকম একটা আলোচনা সকলে মিলে করতে থাকল। কিন্তু না—আলোচনা মিনিট খানেকও গড়িয়েছে কি গড়ায়নি, ডাক্তারবাবু ঘোষণা করলেন—আমি মৃত।

অনেকেই ঠোঁট কামড়ে ধরল।

কেউ কপালের ওপর পড়া চুলগুলোকে সরাতে সরাতে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াল।

শুধু মা—নেই? দেবু নেই? বলে কেঁদে উঠল। এবং ওভাবেই বলতে লাগল, আমার কি হবে রে দেবু—আমায় কে দেখবে? কোনো সাধ পুরণ হলো না তোর। একা একাই চলে গেলি। বুড়ো মাকে একা রেখে কোথায় চলে গেলি রে দেবু—বৌদিরা পাশে উঁচু হয়ে বসে মাকে ছুঁয়ে রইল। আর মা ওভাবেই কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, জানতাম আমি, জানতাম ও এভাবেই একদিন চলে যাবে। কেউ টের পাবে না। সারা জীবন শুধু কষ্ট ভোগ করেই শেষ হয়ে গেল গো ছেলেটার—কেউ দেখলে না দেবু, তোকে কেউ দেখলে না।

পাড়ার আশেপাশে খবর ছড়িয়ে পড়ল। কেউ বলল,

—কে মারা গেল, কে?

—আহা গো···এই বয়স...দুগ্‌গা দুগ্‌গা···

—দেবু মারা গেল? এ্যাঁ—বল কি।

এটা তপনের গলা। আমার বন্ধু। বর্তমানে ঠিক বন্ধু নয়। তবে বহুদিন বন্ধু ছিল। এখন যে কোনো পরিচিত লোকের মত। তবুও —দেখতে এসেছিল তাহলে? যাক্, ভালো। আমি সুখী। আর কিছু না, বিশ্বাস কর শুধু এইটুকুই এখন চাই। একটু একাত্মবোধ। ভালবাসার কথা বলছি না। ও শব্দটা বড় জোচ্চোর। ওকে নিয়ে আজ আর কিছু না বলাই ভাল। ও দূরেই থাক্।

কিন্তু বোনেদের খবর পাঠাতে হবে তো? —কে একজন এমন কথা বলল। উত্তরটা অনেক চাপা কথার ভীড়ে ঠিক শুনতে পেলাম না। তবুও কেউ যে যাবে এটা নিশ্চিত।

আসতে নিশ্চিত দেরিও হবে। কারণ কেউ থাকে চন্দননগর। কেউ চুঁচড়ো। আর কারুর বাড়ীতে ফোন নেই সুতরাং কেউ গিয়ে খবর দেবে —তারপর।

যদিও দুপুর দুটো নাগাদ তিন বোনই এল। এবং অতি স্বাভাবিক ভাবে কমবেশী কাঁদল। কিন্তু মেয়েদের কান্নার ব্যাপারে কোনোদিনই আমি

বিশেষ কিছু মনে করি না। কারণ ওরা একজনকে কাঁদতে দেখলেই আর একজন কাঁদে। যদিও এই মুহূর্তে আমি তা বলতে চাইছি না। বরং এখানে একটা প্রথাগত রক্তের সম্পর্ক.....

কে কাঁধ দেবে? সবাই তো বড়—

আমার এই চিন্তার সঙ্গে অনেকের চিন্তাই মিলল। সমাধানও তৈরী হলো স্বপন ও তার বন্ধুদের নিয়ে।

আমার অবাক হবার মতো কিছু না হলেও একবার ক্ষণিকের জন্যও ভাবলুম—ওহ বাস্তব কি বিচিত্র! কি কঠিন! যে স্বপনের সঙ্গে আমি আজ দশ বছরের ওপর কথা বলি না। স্নেহ বলে জিনিষটার সঙ্গে যখন কোনো সম্পর্কই নেই। ঠিক তখন স্বপন ও তার বন্ধুরা আমায় শ্মশানে নিয়ে যাবে। আশ্চর্য!

আচ্ছা, স্বপন বা ওর বন্ধুরা কি কখনো ভেবেছিল এরকম একটা ঘটনার সাক্ষী ওদের থাকতে হবে মানুষের প্রতি সহজাত শ্রদ্ধাকে নিয়ে। অথবা আমি? আমিই কি ভেবেছিলাম?

যদিও স্বপনের আঙুল যখন যত্ন করে আমায় চন্দনের ফোঁটা দিয়ে সাজাতে লাগল আমার শরীরটা শিউরে উঠল। মনে হলো, কেন? কেন এই চন্দনের টিপ? আবার পরক্ষণেই ভাবলুম, একে সাজানো বলা যায় তো? অমনি—

—ও মা কি সুন্দর দেখাচ্ছে দেখ, যেন ঘুমোচ্ছে। এরকম বলল আমার ছোট বোন।

অর্থাৎ আমি আগের থেকে এখন একটু সুন্দর হলাম? অবাক কাণ্ড।

কিন্তু এমন তো হবার নয়। কেননা আমার সেই কিশোর বয়স থেকেই এ্যাগজিমা। হাতে মুখে পায়ে পিঠে প্রায় সর্বত্র।

গায়ের রঙও কুচকুচে কালো। এত কালো আমাদের বংশের কেউ নয়। একমাত্র আমি। তার ওপর মুখে রোগটা থাকায় চামড়ায় ভাঁজ পড়ে। খুব বিশ্রী দেখায়। আমি জানি। রূপ শব্দটা আমার কাছে অবান্তর। হতে পারে খুব ছোটবেলায় দেখতে ভাল ছিলাম। অন্ততঃ স্বাভাবিক।

তবু ভাবতে ভাল লাগে পরজন্মে.....

সত্যি কিছু আছে না কি?

এবং তারই তোড়জোড় স্বরূপ রাস্তা দিয়ে হরিধ্বনি দিতে দিতে ওরা চারজন আমায় শ্মশানে নিয়ে এল।

মাঝে মধ্যেই যদিও রাস্তায় থমকে দাঁড়িয়েছে কাঁধের তলায় গামছা-গুলোকে মোটা করে নিতে।

কেননা ব্যথার উপশম ঘটবে।

কেননা আমার ওজন না কি বেড়ে গেছে খুব।

কিন্তু শ্মশানে আসতে দেখা গেল সেখানে খুব একটা বেশী ভীড় নেই। দু-একটা চুল্লী খালিও।

তবে আমাকে ইলেকট্রিক চুল্লীতে পোড়ানো হবে এটা আগে থেকেই ঠিক হয়েছিল। কারণ সময়ের সাশ্রয় হবে। খরচও কম।

কিন্তু যদি লোড শেডিং হয়, তাহলে?

না—জানা গেল এখানে না কি তা হয় না।

তবু মুক্তি। শান্তিতে শেষ হওয়া যাবে। অর্ধেকটা জ্বালিয়ে চলে যাবে না ডি-ভি-সি বা সি-ই-এস সি, এই যথেষ্ট।

মুখাগ্নি করল স্বপন।

যদিও ইলেকট্রিক চুল্লী, কিন্তু; প্রাচীন নিয়ম অনুসারে ব্রাহ্মণের কাজটা সেই হলো।

তারপর চুল্লীর দরজাটা খুলতেই বেশ কিছু ছেলে বুড়ো ছুটে এল ভেতরটা দেখবার জন্য। আচ্ছা, মানুষের ভেতরটা দেখবার জন্য মানুষের আগ্রহ হয় না কেন?

কিন্তু কেউ উত্তর দিল না। যেন উত্তর নেই-ও। তখন ডোমটা আমাকে একটা কাঠের পাটাতনে করে ঠেলে দিতেই একবার শেষবারের মত ধন্যবাদ জানালাম একটা মানুষকে। মনে হলো ওই আমার মুক্তিদাতা আমার সমস্ত অসুখের ওষুধ। এবং পথ্য। একটা অসম্ভব আনন্দে আমার মন ভরে গেল। মনে হলো এই প্রথম আমি জ্বানত নিরোগ হবো। স্বাভাবিক। সুন্দর।

অন্য কারোর কথা বিশেষ মনে হলো না।

বহু চেনা-জানা মানুষের সার সার ফুলগুলো পর পর ভেসে ভেসে গেল।

শুধু একটু বিশেষ ভাবে আলাদা থাকল—মা।

আর অনেকখানি জুড়ে আমি।

তবু মনে মনে শেষবারের মত সকলকেই একবার বিদায় জানালাম। ইচ্ছে হলো, তাই। হয়ত ভালোলাগাও বলা যায় একে।

আর তারপর আগুনের প্রচণ্ড তাপে আমার শরীর পুড়ে যেতে লাগল।

মন ও শরীরের সব রোগ থেকে আমি একটু একটু করে মুক্ত হতে থাকলাম।

মনে হলো এই প্রথম ঈশ্বর আমাকে জড়িয়ে ধরলেন উষ্ণ আলিঙ্গনে। অন্তের কাছে সব দায়িত্ব আমার মুছে গেল।

শুধু স্মৃতি হয়ে উঠলাম আমি। দেবু। শ্রী অমিত গুপ্ত।

With best compliments from :

3, Umesh Dutta Lane
Calcutta-700006

'পালা টিপং'-এর গপ্‌পো

(লাখার উপকথা)

চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়

[পাশ্চাত্য গল্পের স্টাইল এবং মেজাজ যখন সমকালীন গল্পকে অনেকাংশে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, যখন নতুন ভাবনার দ্বারোদ্ঘাটন ঘটছে ঠিক তখনই এই গল্প পরিবেষণে একটা উদ্দেশ্যই কাজ করে—আমাদের এই ভারতবর্ষের কোনো এক দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে ৭৬০০ ফুট সমভূমি থেকে ওপরে নীল পাহাড়ের দেশের মিজো এবং নাগাদের সাহিত্যকে কর্মব্যস্ত সভ্যতায় নামিয়ে আনা। ঐ অঞ্চলে আধুনিক সভ্যতার কোনো ছোঁয়াই নেই। হাজার বছর আগের প্রপিতামহদের মতই উত্তরসূরীরা জীবন কাটাচ্ছেন। দেশ-জাতির সঙ্গে এদের পরিচয় ঘটে মাত্র একটি দিনে, যে দিন তারা দল বেঁধে ভোট দিতে আসে।

'পালা টিপং' এর গপ্‌পো আদৌ গপ্‌পো না সত্যি ঘটনা তা জানা যায় না। কারণ যুগ যুগ ধরে এই কাহিনী লোকমুখে প্রচলিত হয়ে আসছে। নোতুন গল্প এখানে এখনো লেখা হয়নি এবং আর হবেও না। কারণ মানুষের চাঁদের দেশে পাড়ি দেবার পরেও এদের মধ্যে গল্প লেখার প্রবণতা আসেনি। এর কারণ কয়েকটা—জীবিকা, খিদে এবং বেঁচে থাকা। এদের সেই লোককাহিনীগুলোও কেউ কখনো শোনেননি কারণ সুযোগ এবং প্রয়োজন দুটোরই যথেষ্ট অভাব ছিল। অথচ বহিরাগত পণ্ডিতরাই তাঁদের কথা ও কাহিনী একসময় ধরেছিলেন এটাই ভারতীয়দের লজ্জা। লণ্ডনে ডেভিড নট ১৯০৮ সালে 'দি মিজিরস' নামে এডোয়ার্ড স্টেফকে দিয়ে একটা কাজ করিয়েছিলেন।

'পালা টিপং,' এর গপ্‌পো কল শেকসপীয়ের-এর 'দি লুসাই কুকি ক্লানস' নামক বই থেকে নেওয়া হয়েছে। এই বই এবং কাহিনী উদ্ধারের জন্য সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রাপ্য যাঁদের—তাঁরা হলেন শ্রীলালথামা (আই. এ. এস.) এবং এ. পি. এস. সি-র চেয়ারম্যান শ্রদ্ধেয় শ্রীসূর্যনারায়ণ বরকটকী মহোদয়ের]

—অনুবাদক।

অনেকদিন আগের কথা। এই পালা টিপং (পুকুর) তখন ছিল এক গ্রাম, যেখানে ছিল শ'তিনেক ঘর। সেই গ্রামেরই কোনো এক পাহাড়ের

গুহায় ছিল এক বিশাল সাপ। যে প্রতি রাতে তার প্রচণ্ড খিদে মিটানোর জন্যে গ্রামের একটা করে শিশুকে খেয়ে ফেলতো। সাপটির এই উপদ্রবে অতিষ্ঠ হয়ে গ্রামবাসীরা সাপটাকে মারবার সিদ্ধান্ত নিলো। গুহার চারধার ঘিরে ফেলে নানান কৌশল খাটিয়েও তারা সাপটাকে মারতে পারলো না। শুধুমাত্র অনেক কষ্ট করে গুহা থেকে তার বিশাল লেজটা টেনে বের করে কেটে ফেললো। অবশিষ্ট শরীর নিয়ে যন্ত্রণায় গুহার ভেতর বিকট আর্তনাদ করে উঠলো সেই সাপ। গিরিশৃঙ্গ, বন-গাছপালা থরথরিয়ে উঠলো তার চীৎকারে। ভয়ার্ত গ্রামবাসীরা যে যেদিকে পারলো, পালালো। কিন্তু কোথায় পালাবে? ইতিমধ্যে সেই গুহা থেকে বেরিয়ে আসতে থাকলো দুরন্ত উন্মাদ জলস্রোত। সেই জলের স্রোতে সারা গ্রামটা দেখতে দেখতে তলিয়ে গেলো।

এই ঘটনার অনেক বছর পরে এক গোরা সেনাপতি 'পালা টিপং'-এর ধার দিয়ে চলেছিলো তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে। কিন্তু সেনাপতির অসাবধানতায় তার তলোয়ার কোনোভাবে সেই পুকুরে পড়ে যায়। তখন সেনাপতি একজন সৈনিককে জল থেকে তাঁর তলোয়ারটা তুলে আনতে আদেশ করলেন। সেনাপতির আদেশে সৈনিক ঝাঁপ দিলো পুকুরে। কিন্তু সৈন্যটি সেই যে নামলো জলে আর ওঠেই না। তিনদিন পরে সে খুব সুস্থ শরীরে জল থেকে উঠে এলো এবং বললো: এই পুকুরের নীচে এক বিরাট গ্রাম আছে। সেখানে অনেক লোকের বাস। তারা আমাকে প্রচুর খাইয়েছে, খাতির করেছে। একথা শুনে সেনাপতি সেই সেনাবাহিনীকে আদেশ করেন অবিলম্বে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে এবং গ্রামটি দখল করতে। সেনাবাহিনী আদেশ পাওয়া মাত্রই ঝাঁপিয়ে পড়লো কিন্তু আচম্বিতে চারদিকে উঠলো ভয়ংকর ঝড়। দুর্যোগের দাপটে অর্ধেক সৈন্য সেখানেই প্রাণ হারালো। বাকীরা যারা অর্দ্ধমৃত হয়েও জীবিত ছিল তারা প্রিয় সৈনিকদের স্মৃতিরক্ষার্থে বাঁশ গাছ কেটে ক্রশ তৈরি করে রেখে চলে গেলো।

এসব অনেক আগের কথা। কিন্তু আজও 'পালা টিপং' এর ধারে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা ক্রশ। আজও লোকমুখে ছড়িয়ে আছে সেই গল্প। লাথার সম্প্রদায়ের লোকেরা দৈব এবং অলৌকিকতার ভয়ে 'পালা টিপং'-এ ভুল করেও গা ভেজায় না কখনো। এমনকি কাছাকাছির মধ্যে চাষবাস পর্যন্তও করে না। 'টংকলঙ' নামক এই জায়গায় যদি কেউ কখনো আসে, এই 'পালা টিপং'-এর গপপো না শুনে ফেরে না। 'পালা টিপং' এখন শান্ত কিন্তু কেই বা জানে তার নীচের সেই গ্রামের গ্রামবাসীরা এখন কেমন আছে?

দূরত্ব ● সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

ছাইয়ের স্তূপ—
কেউ ফুঁ দিচ্ছে না—
দুটো হাত থেকে দুটো হাত দূরে
কেউ ঝড় উঠছে না

এইভাবে
দু.টা ঘরের দরজা এঁটে যাচ্ছে
মাঝখানে পাশবালিশ—

অথচ
ঘন নিঃশ্বাসের ফুঁ দিলে
হাত দুটো বাড়িয়ে দিলে
অথচ
দরজা খুলে দিলেই

দেখতে পেত
শুনতে পেত
কেউ না কেউ
দূরে এবং কাছে—
দূর থেকে কাছে

আগামী সংখ্যায় একজন বিশিষ্ট কবির
সাক্ষাৎকার সহ তার গুচ্ছ কবিতা

সারা বছর এই রকমই ● পবিত্র মুখোপাধ্যায়

ভাঙা ঘরগুলোর নড়বড়ে ছাউনিগুলোর
নিচে উঁই-এর সংসার ওরা
চনমনে রোদ্দুরে উড়ছে ওরা
বৃষ্টিতে গুছিয়ে তুলছে
গেরস্থালি সারাবছর
এই রকমই

কম্বলের নিচে হাড়জিরজিরে মানুষ
মাথার নিচে তেলচিটে বালিশ
ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে স্বপ্ন
দেখছে সারাবছর
এই রকমই

সুচাঁদ মিস্ত্রি খবর নিয়ে এলো শহর—
থেকে এবার
গেলোবারের মতন বৃষ্টি
হবে বানে
ভাসবে ক্ষেতখামার ভেসে—
যাবে গরুবাছুর বাঁধ
খুলে দেবে শহর
বাঁচাতে

চনমনে রোদ্দুরে তখন
উড়ছিলো উঁই ওরা
গুছিয়ে তুলছিলো সংসার আর—
ধোঁয়া ওঠা মানুষগুলো
কম্বলে জড়িয়ে হাড়জিরজিরে শরীর
পাশ ফিরে
শুলো সারাবছর
এই রকমই

ভালোবাসা ● অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

গভীর শীতলতায় তুমি লালচে নরম আগুনের মত এসেছিলে অকস্মাৎ
খুব নীচু স্বরে বলেছিলে ভালো আছো কতদিন পর দেখা হল
এইসব আন্তরিক উচ্চারণ এইসব অতিথি বাতাসে মৃদু গন্ধ ওড়াওড়ি
কচি বনকাগজী পাতার শরীর এবং অন্ধকার আমাকে একা করেছিল
তোমার জন্য একদিন আমার বড় ভাবনা ছিল তোমার জন্য একদিন আমার
বড় তৃষ্ণা ছিল তোমার জন্য একদিন আমার ভীষণ দুষ্টুমিও ছিল

তুমি চাইলেই আমি পর্বতারোহনের উত্তেজনা জলে নামবার মজা
ট্রেন চলে যাবার পর নির্জন স্টেশনের আলো নিবিড়তা ও ভুল
সব কিছু তোমাকে দিতুম সবকিছু তোমাকে দিতে পারতুম

কিন্তু তোমার বয়সের অহংকার তোমার চপলতার উষ্ণ অস্থিরতা
তোমাকে স্থির জলের মত আবদ্ধ করেনি বলে
তুমি চলে যাবার পর এতকাল আমি বেশ ছিলুম বেশ
তুমি চলে যাবার পর মনে হল এইতো কেমন সহজে বেঁচে আছি

আসলে বয়সের বোকামি কিম্বা অল্পবয়সের পাগলামি
তাহাকে জেনেছি ভালোবাসা তাহাকে জেনেছি ভালোবসা

আমি চাই ● সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায়

লটারির দোকান থেকে বেরিয়ে এলো একটি কিশোরী তার বান্ধবীকে নিয়ে
ডাইরির বুক-পকেটে টিকিট রেখে
কয়েকশো বকুলের বুকের রক্ত ছড়িয়ে হেসে উঠলো তারা,
অসুস্থতা ভুলে গিয়ে আকাশ ও সূর্যকে ইচ্ছে হোলো ধন্যবাদ জানাই,
আমি সব সময়েই চেয়েছি শিবু মামার থেকে হরিপদ কেরানী
সব্বার দু-হাত ভরা টাকা হোক্
পা থেকে মাথা পর্যন্ত মোজায়েক করা বাড়ি হোক,
ছুটির দুপুরে গাড়ির পেছনে খাবার নিয়ে
তারা সবাই বেরিয়ে পড়ুক প্রিয়জন নিয়ে শীতের রোদ্দুরে।
আমার নীল-জ্যাকেট ছোট হতে হতে হাস্যকর হয়ে উঠলেও
আমি এখনও চাই ভালোবাসা থেকে ওল্ডম্যক
যেন সবাই ভাগ করে খেতে পারে স-মা-ন স-মা-ন।

জুট মিলের তুচ্ছ ফটোগ্রাফ ● সুশীল পাঁজা

ঘাম ভেজা শরীরে শ্রমিক পরনে ময়লা পোষাক
খটাখট তাঁতের শব্দ ঝাঁ ঝাঁ রোদে দাঁড়িয়ে পাটের ট্রাক
আর জেনারেটারের দাপাদাপিতে কাঁপছে মিলের চাতাল সারাক্ষণ
রূঢ় মেজাজে হাঁটে লেবার অফিসার
পিছু নেয় ইউনিয়ন লিডার
অই চাতালে শ্লোগান, মৃদু ভাষণ, হাঁক ডাক তর্ক গুঞ্জন···
গাড়ী ঢেলে বয়লারে কয়লা দেয় রুক্ষ মাথায় বিষাদ শরীর
ম্যানেজারের ডানে বামে ওয়াচ গার্ড রঙিন ছাতা, ক্রুর দৃষ্টি
ফেলে শ্রমিকের ওপর
চাটুকার কেরানী এদিক ওদিক ইলেকট্রিক পাখার নীচে গল্পের টেবিল
বোনাস, বাজারদর, পরস্ত্রীর শরীর, দাদা-বোনের বিয়ের কার্ড
অফিসার্স বাংলোর···
বিকেলে ফুলের উঠোনে গ্লাক্সো টিন শিশু
সজ্জিত বিবি, চাকর বাকর, পোষা বুলডগ, কান্তে হাতে মালিনী
গঙ্গার বাতাসে খোলে নাইট ক্লাব প্রত্যহ সন্ধ্যায়
জড়ো হয় ভারতীয় সাহেব মেম আলো অন্ধকার ক্লাবের সৌখিন
বাসরে
পেয়ালা পিরিচে ঠোকাঠুকি নাচ গান উত্তাল শরীর
শরীরে শরীর ভেজায় নারীর মাংসল শরীর
সারা রাত হুল্লোড়ে ভাঙে পান পাও-পেয়ালা-পিরীচ টাটকা ফুলদানি
দূরে খটাখট তাঁতের শব্দ, ঝাঁ ঝাঁ রোদে পাটের ট্রাক
ঘাম ভেজা শরীরে দুঃখী শ্রমিক পরনে ময়লা পোষাক...

না ● নৃসিংহ মুরারী দে

চেয়ে দেখ চারিদিকে পাথরের গায়ে আগুন লেগেছে
দাউ দাউ করে জ্বলছে। শোন
কান পেতে শোন। কোন দিকে যেন শব্দ হচ্ছে
উত্তাল দামামা। তোমার গায়ে ধাক্কা লাগেনি
এখন-ও। জান না তুমি শুরু হয়ে গেছে
উলঙ্গ নারীর নাচ। তুমি এ সব
কিছুই জান না এখনো!

সবাই দেখ না উন্মত্ত, বেজে চলেছে সিমফনি
রক্তলুপ্ত যোনী থেকে বেরিয়ে এসেছে সূর্য
কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে জীবনের মাধুর্য
চারিদিকে নাচ, হাহাকার আর মুমূর্ষু সব চেতনা
কথার ডগায় চাকু আর স্তনের বোঁটায় ভাবনা
জানলার কপাট খুলে দেখ চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে অ্যাগনি।

পাথর পোড়ার গন্ধ তুমি পাও নি? দেখ নি
অদৃশ্য আগুন? তুমি বোমের বারুদ-ও দেখনি

এ পৃথিবী তোমার জন্যে নয়
মানে মানে কেটে পড়। তোমার জন্যে
বৈকুণ্ঠ আছে খোলা। সেখানে মেয়েরা
ল্যাংটা হয় না। মদ পাবে না বাজারে
এখানে, অনাহুত শিশু জন্ম নিচ্ছে ওপেন বলাৎকারে!

তোমার জন্যে সাজান আছে হাসনাহানা ফুল
কিছু হবে না তোমাকে দিয়ে

কেবলই কর ভুল। শুনেও তুমি শোন না?
দেখেও তুমি দেখ না? এখানে থাকতে হলে
মানুষের জন্ম দিতে হবে
দেখবে সেই পাথরগুলো জ্বলছে
শুধু দাউ দাউ করে জ্বলছে!

সাক্ষাৎকার

(একজন বিশিষ্ট গল্পকারের সঙ্গে)

উপেক্ষিৎ শর্মা

আমার যাওয়া আর ওঁর থাকা কিছুতেই মিলছিলো না। কিছুতেই না। যা স্বাভাবিক। যা হয়েই থাকে। আর সে জন্যেই ধরে নেওয়া যাক, এই 'যাওয়া এবং থাকা' মিলবে না। ধরে নেওয়া গ্যাছে, মিলবে না। কিন্তু মিলে গ্যালো। হঠাৎ। একদিন। মিলে গ্যালো আমার যাওয়া আর ওঁর থাকা। বাড়ীতে। ওঁরই বাড়ীতে। ঢুকতেই—

—আরে, এসো। কি খবর!

—এই তো, আপনার কাছে....

—তোমার কাগজটা পেয়েছি। শনিবার এসেছিলো। বলে খাটের ডান পাশে একটা র‍্যাকের মধ্যে এলোমেলো কয়েকটা লিট্‌ল-ম্যাগ-এর ঝাঁক থেকে আমার পত্রিকাটা বার করে হাতে নিলেন। কভারটা দেখতে দেখতে,

—নামটা ঠিক হলো না। এসব আজকাল চলে না। কাগজের নাম রাখো, 'কোলকাতার বুলবুল'। (কিম্বা 'বুদ্বুদ'ও হতে পারে, ঠিক শুনতে পেলাম না।) কি'রম লিখছো!

—লিখছি তো! কিন্তু কি'রম সেটা তো আপনারাই বলবেন।

—আমাদের কাছে শুনতে খুব ভালো লাগে!

—নিশ্চই। ভালো লাগে বৈ কি? আপনারা বলবেন, তবে তো বুঝবো হচ্ছে, নইলে—

—নইলে লেখা ছেড়ে দেবে। পারবে লেখা ছেড়ে দিতে?

—হ্যাঁ, তা পারবো। পারবো মানে, নিশ্চই পারবো যদি বুঝি কিছু হচ্ছে না; কারণ এটা তো আমার পেশা নয়,...

—ওসব ছাড়ো! বুক বাজিয়ে বলো তো দেখি, লেখা ছেড়ে দিতে পারবে, তবে বুঝবো কিছু হবে।

মাথা নীচু করে কয়েক মিনিট বসা, কারণ বুক বাজিয়ে কিভাবে বলতে হয় জানিনা। উনি কাগজটা ওল্টাতে ওল্টাতে,

—নোতুন, শক্ত লেখা দাও। আজেবাজে ট্র্যাশ লেখা লিখে কাগজ নষ্ট করার কোন অধিকার নেই। থাকতে পারে না। কারো না। কারোর না। বলে উনি আমার লেখা গল্পের পাতাটা বার করে চোখ বুলোতে বুলোতে।

—সুরুটা ভালই। আরম্ভটা মন্দ না। আঃ। এই, এই তো দোষ। এই 'ঠা ঠা রোদ', এসব বড্ড ক্লিসে হয়ে গ্যাছে। বড্ড পুরনো। সুরুর সেন্টেন্সের সঙ্গে একেবারে বেমানান। এখানে আমি হলে...

আমি তো আপনি নই, বলতে ইচ্ছে করলো, কিন্তু বললাম না। মাথা চুলকোবো ভাবলাম। চোখ সোজা করবো ভাবলাম। যুক্তি দোবো ভাবলাম। কিন্তু—

—পড়ো, পড়ো। নোতুন কে কি লিখছে পড়ো। ছাখো, কোনটা এখনো ব্যবহার হয়নি, কোনটা এখনো ঝক্‌ঝকে···

বলে ওঁর কথা শেষ না করার স্বভাব বজায় রেখে কাগজটা খাটের এক ধারে ফেলে গা এলিয়ে শুয়ে পড়লেন। দেখলাম ওঁর হাড়-মার্কা কথার সঙ্গে চেহারাটাও পাকিয়ে উঠেছে। হয়ত অন্তর্দৃষ্টিটাও। হয়ত ভবিষ্যতের শেষ পর্বটাও। হয়ত...

—এখন কি পড়ছ?

—পড়া শেষ করেছি।

—শেষ!!!!

চোখেমুখের আশ্চর্যচিহ্নগুলো বুঝিয়ে দিলো উত্তরটা বেখাতে বয়ে গ্যাছে। ঝট্‌তি সামলে নিয়ে

—মানে, অ্যাকাডেমিক পড়াশুনা,

—অ্যা কা ডে মি ক', বলে একটু থেমে 'ও য়া খ' করে হঠাৎ একটা দমকা কফ বুক থেকে তুলে আলজিভে ঘুরিয়ে বললেন,

—ছাখোতো, নীচে পিক্‌দানিটা আছে...অনুরোধটা স্বচ্ছ নয়, তবু ওঁর নিভাঁজ ঔদ্ধত্যে এটাও বুঝি মানিয়ে যায়। মেনে নিতে হয়। বললেন—

—দাও তো। তুলে ধরলাম। উনি গায়ের উগ্‌রে (ব্যাপারটায় অনেকে হয়ত ওঁর 'অ্যাকডেমিক কেরীয়ার' সম্পর্কের ব্যক্তিগত অভিরুচির অভিব্যক্তি মনে করতে পারে, কিন্তু আমার তা মনে হয় নি, মনে হয় না) বললেন—

—তুমি তো 'শেষ' করেছো। আমার সুরুই হল না, হল কিনা জানি না। সেক্সপীয়ার পড়েছ? পড়েছ নিশ্চই। কোনটা ভালো। ট্রাজেডি-গুলোর মধ্যে...

—রোমিও জুলি

—রোমিও জুলিয়েট। সবচেয়ে বেশী শোনা নাম। সবচেয়ে বেশী সেক্স। তাজা। ডব্‌ডবে। বলে চুপ করলেন। যেন পরের 'হাড়-মার্কা' কথাগুলো জিবের তলায় সাজিয়ে নেবার সময় নিচ্ছেন।

—ওটা ট্রাজেডি! হে হে। পাশে বসে থাকা একটা রোগাপ্যাংলা 'তোসামুদে' ছেলে ফোঁ ফোঁ করে হেসে ফেল্লো। এই মুহূর্তে আমার কাছ থেকে একটা থাপ্পড় প্রাপ্য হল ওর এবং তা তোলা রইল। বললাম,

—না, মানে ওটাকে ঠিক প্রপার ট্রাজেডি অবশ্য বলা যায় না...

—তাহলে, আনপ্রপার ট্র্যাজেডি। বলে তোসামুদেটা ঠোক্কা মারল। ওর ইংরেজীর বহর দেখে ওর গালে একটা জ্যাব্‌ড়া থুথু ছোঁড়াওতুলে রাখলাম। লেখকের দিকে চেয়েই বললাম,

—...বরং ওটাকে সিরিওকমিক ট্র্যাজেডি বা ট্র্যাজিক কমেডি বলা যায়, মানে

—তাহলে কোনটাকে কমেডি বলছ। ফুল কমেডি? কমেডি অফ্ এররস।

—না। আমি কিন্তু টুয়েল্‌ফথ নাইট বেশী এনজয় করেছি।

—ওটাতো অ্যারাবিয়ান স্টোরী। সেক্সপীয়রই নয়। বলে তোসামুদে, ঝোলা নাকটা উঁচু করল। আর ওর জন্যে একটা হা হা হাসি তুলে রাখলাম। লেখক

—কেন, ম্যাকবেথ, ওথেলো, এগুলো তো মারমার কাটকাট ট্র্যাজেডি।

—...আসলে ওগুলোর হীরোইজ্‌মগুলো মাঝেমধ্যে খুব খেলো আর ইম্পোজড মনে হয়। অবশ্য ক্লাইম্যাক্সগুলো অপূর্ব

—আর জুলিয়াস সীজার? তোসামুদের উত্তরটা একটু ঘুরিয়ে বললাম

—ব্র্যাণ্ডোর তো। মারলোন ব্র্যাণ্ডোর? অপূর্ব। অদ্ভুত।

তোসামুদে চোখের নীচে আশ্চর্য পুট্‌কি বসিয়ে লেখকের দিকে তাকিয়ে হাসবার অনুমতি চাইল। যেন 'পাওয়া গ্যাছে'। যেন 'হোঃ হো। কিন্তু লেখক অনুমতি তো দিলেনই না। আরো গম্ভীর হয়ে আমার দিকে,

—ব্রান্দোর ফ্যান মনে হচ্ছে।

—না, ঠিক ফ্যান না; তবে ওর 'মার্ক এন্টনি'র পোট্রেয়িং আমাকে মোহিত করেছে...

—আর কে মোহিত করেছে। মবিডিক দেখেছো। মিলিয়ন পাউণ্ড নোট। মিউটিনি অন দ্যা বাউণ্টি। এগনি এণ্ড দি এক্সটপী।...

—না, সবগুলো দেখিনি। তবে মবিডিক দেখেছি। কিন্তু ওর টু স্যার উইথ লাভ বেশী ভালো লেগেছে।

—তোমাদের মত বয়সে খুব সিনেমা দেখতাম। দুবার তিনবার করে একেকটা বই...তোসামুদে—ফ্র্যাঙ্কো নীরোধ জ্যাঙ্গো দেখেছেন। মার্সেলো মাস্ত্রানীর ক্যাসানোভা সেভেন্টি।

—না, দুটোই দেখিনি। তবে দুজনকে অন্য ছবিতে দেখেছি ক্যামেলটে নীরো ছিলো, রিচার্ড হ্যারিসের সঙ্গে। আর মাস্ত্রোনির প্লেস ফর লাভার্স, সান ফ্রাওয়ার। লেখক—প্লেস ফর লাভার্স। নামটা শোনা শোনা। কার বই বলতো! কে কে ছিলো।

—ডি-সিকার বই। দুটোই। প্লেস ফর লাভার্সে মাস্ত্রোনির সঙ্গে মনিকা ভিটি, না, ফে ডানওয়ে ছিলো। খুব লিরিক্যাল ছবিটা। অদ্ভুদ বাঙালীয়ানা আছে...

—বাই সাইকল্ থীভস দেখেছো।

—না, সুযোগ হয়ে ওঠেনি

—ইস্! যেন স্বর্গ হতে বিদায়। যেন উড়তে উড়তে পাখীটার ভেঙ্গে গ্যাছে ডানা, পড়ে যাচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে। যেন...

তোসামুদে—হরর অব ড্রাকুলা দেখেছেন!

—হরর অব লী। ক্রিস্টোফার লী তো ড্রাকুলাই হয়ে গ্যাছে বলতে গেলে। অবশ্য ভ্যাম্পায়ারের একটা বই দেখলাম পোলাস্কির, 'ফেয়ারলেস ভ্যাম্পায়ার কীলার্স''। পোলাস্কি, জ্যাক ম্যাগ্যোরান, স্যারণ টেট। অপূর্ব লেগেছে.....

—ক্রুফো গদার পোলাস্কি তো খুব করছে। পড়ছো কিছু। নাকি পড়া 'শেষ'।

—না, মানে, অল্প বিস্তর পড়ছি।

—আরে বিস্তর পড়ার দরকার নেই। বিস্তর কি পড়বে! বিস্তর লেখা কোই। আমি তো খুঁজে পাইনি। অল্প পেয়েছি। অল্প পড়ো; অল্প। এখন কি পড়ছ!

—মোরাডিয়া। কনফর্মিষ্ট পড়লাম। ফ্যান্সি ড্রেস পার্টি পড়লাম। এখন ঘোষ্ট অ্যাট হুন....

—ঘোষ্ট অ্যাট হুন। মানে একটা বেশ্যার যৌন বিকৃতি নিয়ে গল্প তো।

—বোধায় (বোধায়, কারণ তখন সবে সুরু করেছি, ঠিক বলতে পারছি না)।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। মোরাডিয়া কামু কাফকা পুরনো হয়ে গ্যাছে। ওসবের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের কোন যোগ নেই। মুলামার্ড পড়ো। গ্যাক। উইলিয়াম গ্যাক। দিশীর খবর কি।

—দিশী মানে....

—আরে না না। ধেনোর কথা বলছি না। লেখা-টেখা....আমাদে...। কবিতা পড়ছো...

—রবীন্দ্রনাথ পড়েছি। জীবনানন্দ। বুদ্ধদেবও

—ব্যাস। 'শেস'। আরো এগিয়ে এসো। গল্প শিখতে গেলে কবিতা লাগে। কবিতার লাইন। কবিতার শব্দ ব্যবহার। চিত্রকল্প। একেকটা গল্প একেকটা চাবুক কবিতার মনে "সাঁট" করে পাঠকের পিঠে দাগ মেরে চলে যাবে। গুচ্ছর গুচ্ছ কি পড়েছো রবীন্দ্রনাথ, তারপর

—বিভুতি মানিক তারাশঙ্কর

—বুঝেছি। তারপর···সমরেশ....তারপর...

—জ্যোতিরীন্দ্র নন্দী কিছু গল্প ভালো লেগেছে। কালকূট ভালো লাগে। আর সম্প্রতি দীপেন্দ্রনাথ পড়লাম···

—দীপেন পড়েছ। কেমন লাগল।

—মন্দ না

—আমার লেখা পড়েছ?

—পড়েছি। বিচ্ছিন্নভাবে। কখনো। কোথাও।

—কি পড়েছ।...বলতো। যা মনে আছে, যে লেখা, নাম, গল্পের, নায়কের, নায়িকার, ঘটনা, অংশ

—না... মানে...এখন,...এভাবে...

—মেমারী ফেল করছে। আমারত্ত করে।...

আসলে, আমার স্মৃতিটা আমার কর্তৃত্ব মনে না। যেটা ভাবি মনে রাখবো সেটা মনে থাকে না। যেটা ভালো লাগে যেটা মনে থাকে, যন্ত্রের মত মনে থাকে। কিন্তু যা ভালো লাগে না...। কিন্তু এসব বলা...অর্থাৎ মাথা চুলকোও, মুখ ছোটো করে বসে থাকো...লেখকের কাছে 'পয়েন্ট ব্ল্যাক' অপদস্থ হও...স্লা মেমারী ...। তোসামুদে বাঁচালো। বল্লো,

—হাতে ওটা কি বই।

—রেজার্স এজ। কিনলাম। কলেজস্ট্রীট থেকে।

—ওটা কিনলেন কেন। সদ্য নোবেল পেয়েছে বলে।

আশ্চর্য হলাম। মম তো সেই কবে নোবেল পেয়েছে, সেটা কি সদ্য হ'লো। তাহলে? লেখকের দিকে প্রশ্নবোধক চোখে বল্লাম,

—মমকে কি আবার নোবেল দেওয়া হল।

—সলঝেনিৎসিন সম্বন্ধে তোমার কি মত।

বুঝলাম তোসামুদে বইটা সলঝেনিৎ সিন-এর ভেবেছে। ওকে আমার পায়ের নখ দেখালাম। লেখকের প্রশ্নের প্রতি মনযোগ দিলাম, কারণ তখন জানতাম জানলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতাম। ওটা একটা প্রবাদ প্রশ্ন। বল্লাম,

—আসলে, একটা অসম্ভব ডার্ক-সাইড কে নিপুণ দক্ষতায় এনলাইট করেছেন। অন্তত: গুলাগ-আর্খিপেলাখ তো তাই। অবশ্য ক্যান্সার ওয়ার্ডটা আমাকে ভালোই টেনেছে...

—আর আমি তো কমুনিষ্ট করিনা, মরেও যাইনি। তাছাড়া দেশ থেকে আমাকে বাণিজ্যও করেনি, তাই আমার লেখা তোমায় টানে না...

এরকম ছুঁচ আঘাত আগে কখনো পোরছি বলে মনে পড়ে না। মাথা হেঁট। জুতোর ফিতে বাঁধার ভঙ্গী করলাম। পায়ের তলা চুলকোলাম। লেখকের একটা লেখা চাইব ঠিক ছিলো, কিন্তু বলতে পারছি না। বলতে পারছি না। কিছুতেই না। কোন কথাই না।

—সিগারেট আছে তোমার কাছে।

—হ্যাঁ। বলে পকেটে হাত রাখলাম। ইচ্ছের বিরুদ্ধে এতক্ষণ সিগারেটগুলো পকেটে মোচড় দিচ্ছিল। এখন আর চিন্তা কি। উঠে

দাঁড়িয়ে চাপা প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট প্যাকেট দেশলাই বার করলাম। লেখক একটা সিগারেট বার করে প্যাকেটটা টেবিলে রেখে বললেন,

—ওটা থাক। তুমি বাইরে যাচ্ছো, কিনে নিও। আমি আর বেরাচ্ছি না। শরীর ভীষণ অসুস্থ।

প্রায় এক প্যাকেট সিগারেট ধোঁয়া খাওয়ার ধাক্কাটা তেমন কিছু নয়, কিন্তু এই, 'তুমি আঘাত পাবে' বলার পদ্ধতিটা···। নাকি আমারই ভুল। তবু বল্লাম

—আচ্ছা, তাহলে চলি।

—হ্যাঁ, আবার এসো।

বেরিয়ে এলাম। লেখাটা চাওয়া হয় নি। চাওয়া হল না।

সমাপ্ত

—ঃ সমস্ত রকমের যোগাযোগ ঃ—
সম্পাদক, অস্থিমজ্জা
৬।১বি, উমেশ দত্ত লেন, কলিকাতা-৬

সুবীর দাস কর্তৃক শ্রীলক্ষ্মী প্রেস, ৩৬ডি, বেথুন রো, কলিকাতা-৬
হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ৬।১, উমেশ দত্ত লেন, কলিকাতা-৬
হইতে প্রকাশিত।